সুকুমার দে সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প

সুকুমার দে সরকারের

শ্রেষ্ঠ গল্প

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬২
অগাস্ট ১৯৫৫
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কলকাতা-১২
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
সমীর রায়চৌধুরী
ছেপেছেন
মন্মথকুমার বসু
এভিনিউ প্রেস
১৬, সুরেন ঠাকুর রোড
কলকাতা-১৯
দু-টাকা

3539

আমি যখন লিখতে শুরু করি তখন 'সন্দেশ' পত্রিকার শেষ যুগ। কিশোর বয়স, মনের মধ্যে কল্পনা আর কথার ফুল অজস্র জড়ো হয়ে ওঠে। মালা গাঁথি কী করে? চিরকাল শহরেই বেড়ে উঠেছি। মাঠ, ঘাট আর জঙ্গলের সঙ্গে ছেলে-মনের যে সহজ মিতালি তাকেই ভাষায় বলতে হবে। ভয়ে-ভয়ে প্রথম রচনা 'সন্দেশ' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। 'সন্দেশ' পত্রিকার তখনকার সম্পাদক করুণা বাবু ডেকে পাঠিয়ে অনেক উৎসাহ দিয়েছিলেন।

এর পর সাহিত্য-জীবনে সবচেয়ে বড় উৎসাহ এবং সাহায্য পাই তখনকার ছোটদের বড় পত্রিকা 'রংমশালে'র সম্পাদক প্রফেসর খগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কাছে। 'রংমশাল' পত্রিকায় নানা রকম রচনার চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে খগেনবাবু প্রায় দরাজ হাতে নানারকম প্রচেষ্টার সুযোগ দিয়েছিলেন। আমার মতে আমার দেখা ছেলেমেয়েদের পত্রিকার মধ্যে আমার মনকে সবচেয়ে আকর্ষণ করেছিল —'বালক', 'সন্দেশ', 'মৌচাক', 'খোকাখুকু', 'রংমশাল' এবং 'রামধনু'।

সাহিত্য-জীবনে অনেকের কাছেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয়। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ে এঁদের নাম—শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, বন্ধুবর ও সুসাহিত্যিক শ্রীসতীকান্ত গুহ, শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী, শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং 'রামধনু' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়। সতীকান্ত বাবুর উৎসাহ এবং সাহায্য না পেলে আমার অনেক বইই বইএর আকার পেত না এবং হয়ত সাহিত্য-জীবন অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যেত। পরবর্তী জীবনে প্রকাশক শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর উৎসাহ আজও সাহিত্য-জীবনকে একেবারে শেষ হয়ে যেতে দেয়নি। এই বইএর বেশীর ভাগ গল্পই অমিয়বাবুর পছন্দ করা। এগুলি যাদের জন্য লেখা আশা করি সেই কিশোর-বন্ধুদের ভালো লাগবে।

সুকুমার দে সরকার

গল্পের বইয়ের পোকা
গোপা আর কুণিকে—

এই লেখকের

ময়ূরকণ্ঠী বন

দুই খুনী

২৪শে এপ্রিল, চুপ

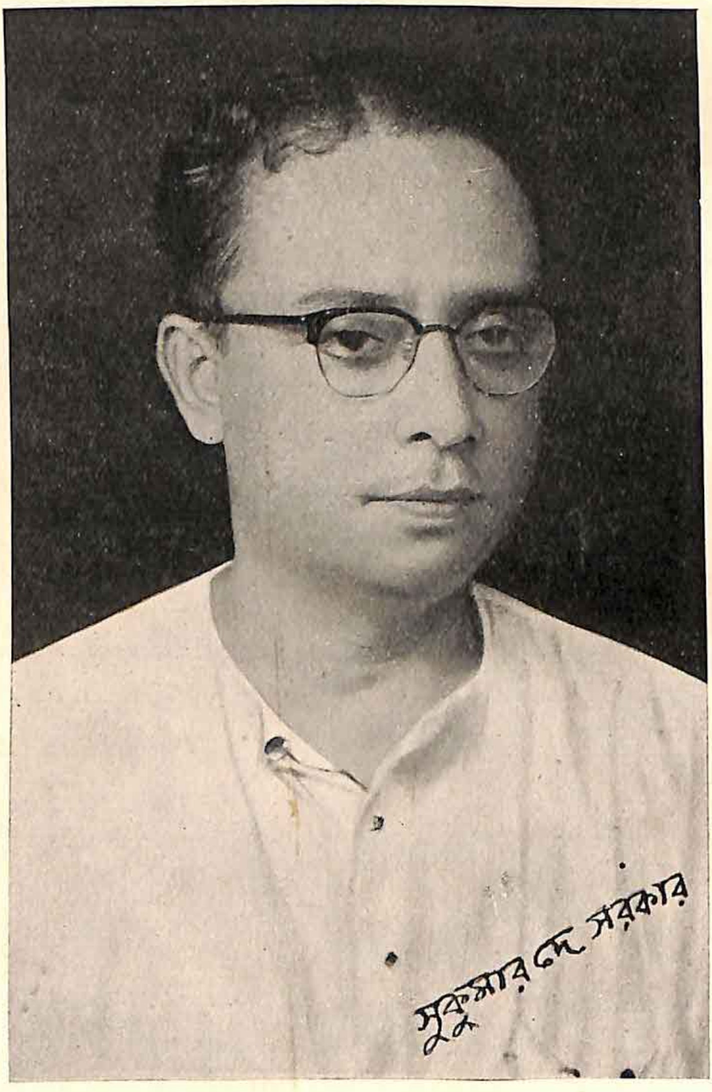
নিশাচর

অরণ্য-রহস্য

মনটা হু-হু করে

হীরা-কুণি

দুধসায়রের পথে


সুকুমার দে সরকার

মহাশের

দিঘির জলে এতটুকু কাঁপন নেই, গাছের পাতা স্থির। বিস্তৃত বিশাল দিঘি পার হয়ে মাঠ, তারপরে যতদূর দৃষ্টি চলে—সবুজ ধানের ক্ষেত ঝিম্‌ঝিম্ করে। দিঘির উপর নুয়ে পড়া একটা গাছের ডালে বসে একটা ফিঙে টুপ্‌টুপ্‌ করে ল্যাজ দোলায়। দিঘির জলে সেই ছায়াটুকু শুধু কাঁপতে থাকে। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে বিশ্রমিত জগৎ—একটা গরম হাওয়া শুধু ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে মাটির উপর থেকে দিঘির জলকে আলগোছে ছুঁয়ে উঠে যায়।

সেই নিস্তব্ধ উষ্ণ মধ্যাহ্নে দিঘির ওপরের জল বেশ গরম। সেই জল ভেদ করে যত নিচে নামতে থাকবে, স্তরে স্তরে জল ততই ঠাণ্ডা হবে। প্রথমে সূর্যের আলো ফিকে হলদে লাগবে, তারপরে ফিকে সবুজ—ঘন সবুজ। আরও পরে নিচের দিকে চেয়ে দেখবে একটা কালোর আস্তরণ, তারপরে ঘন আলকাৎরার চেয়েও কালো। জলের সেই ভয়ঙ্কর কালো রূপ দেখে তোমার ভয় করবে—গাঢ় কালো ভয়ঙ্কর একটা ভয়! তুমি সভয়ে উপরে উঠে এসে সূর্যের আলোয় হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। উঠে আসতে-আসতে হয়ত দেখবে কত ছায়ার মত মাছেরা ল্যাজ নেড়ে-নেড়ে তোমার পাশ দিয়ে পালাচ্ছে। লাল্‌চে রুই, কালো শোলের দল, বিশাল-মাথা কাৎলা

এবং সবার উপরে ঝক্‌ঝকে, পাত্‌লা, ফুরফুরে রূপোলি পুঁটি মাছের ঝাঁক। গাঁয়ের জমিদার মশায়ের যেমন মাছ পোষার সখ, ধরার বাতিকও তেমনি।

কিন্তু ওই যে দিঘির নিচে ভয়ানক কালো গভীর জলের কথা বলেছি, সেইখানে—শুধু সেইখানেই থাকত একজোড়া বিশালকায় মহাশের মাছ। তাদের চলাফেরার সময় জলের বুদ্‌বুদ উপরে উঠে আসত না, তারা গভীর জলের মাছ। এক-একটা নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ দ্বিপ্রহরে জলের ওপর বিশাল একটা আলোড়ন উঠত। পাড়ের উপর থেকে কলরব উঠত—মহাশের! মহাশের!

ওই মহাশের জোড়াটাকে লোকে কত ধরবার চেষ্টা করেছে—স্বয়ং জমিদার বাবু পর্যন্ত; কিন্তু আজও তারা মুক্ত—স্বচ্ছন্দে জলের নিচে ঘুরে বেড়ায়।

সে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। মহাশের কর্তা তখন বড়জোর একটা আধমনি কাৎলার আকারের হবে, তখন সে একবার জালে পড়েছিল। জমিদারবাবু বললেন—দে ওটাকে ছেড়ে দে, এখনো ওটাকে মারবার সময় হয়নি।

ব্যস্, সেই একবার। তার পরে মহাশের ধরবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

গাঁয়ের জমিদারবাবুর বন্ধুরা এসেছেন বেড়াতে। গাঁয়ে প্রচুর অবকাশ, তাই মাছ ধরা একটা অবকাশ-যাপনের প্রশস্ত উপায়। বন্ধুদের মধ্যে রজনীবাবু পাকা মেছুড়ে। তিনি এসেই বলেছিলেন—হ্যাঁ হে, শুনেছি তোমার এখানে নাকি দুটো বিরাট মহাশের আছে?

—হ্যাঁ।

—ধরা যায় না?

—না।

—ধরলে তোমার কোন আপত্তি নেই ত?

জমিদার বাবু হেসে বললেন—না, আপত্তি কী? চেষ্টা করে দেখ।

রজনীবাবু মাছ ধরায় পাকা লোক। কদিন ধরে তিনি লক্ষ্য করছেন, একটা মহাশের ঠিক দুপুর বেলা ভেসে ওঠে। রজনীবাবু এ-কদিনে বিশেষ ছিপ-হুইল সুতো আমদানি করেছেন।

নিস্তব্ধ দুপুরে নীল আকাশের নিচে পৃথিবীও যেন নীল হয়ে গেছে। পৃথিবীর উষ্ণতা দিঘির জল বেয়ে স্তরে স্তরে নিচে নামছে। পুঁটি মাছের ঝাঁক ফুর্‌ফুর্‌ করছে ওপরে। জলের সেই কালো প্রদেশে একটা প্রাণী নড়ে উঠল। জলের ওপর থেকে টুপ্‌ করে একটা শব্দ ভেসে এলো।

মহাশের-গিন্নি বলল—ওপরে যাচ্ছ নাকি?

—হুঁ, বাচ্ছাকে নিয়ে একটু সাবধানে থেকো।

—কেন?

—কদিন থেকে দেখছি, রুই-কাৎলার দল ওপরে উঠে যাচ্ছে, আর ফিরে আসছে না।

—তাই নাকি?

—হুঁ।

মহাশের বিশাল একটা জাহাজের মত ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। তার গিন্নি, বাচ্ছা পড়ে রইল পেছনে, জলের নিচে মাটির গর্তে। কিছুদিন হোলো তাদের একটা বাচ্ছা হয়েছে। পৃথিবীর লোক এখনও সে-খবর রাখে না। মহাশের যেতে-যেতে দেখল, জলের স্তর ভেদ করে তার নাকের সামনে দিয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে একটা কেঁচো যাচ্ছে। কেঁচোটা থেকে একটা সুতো উঠে গেছে উপরে। ওই সুতোটার রহস্য মহাশের

ভালো করেই জানে, কিন্তু তাকে সে আজকাল আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। ওইরকম সূতো ছিঁড়ে সে বছরের পর বছর পালিয়েছে।

কেঁচোটা তিলে-তিলে নেমে যাচ্ছে, মহাশের ল্যাজের বাড়ি মেরে বাঁক নিল, তারপরে কপ্ করে গিলে ফেলল কেঁচোটাকে। তার মুখে আচম্‌কা লাগল একটা প্রচণ্ড টান। এমন টান সে তার জীবনে কখনও অনুভব করেনি। সূতোটা সেই জলের মধ্যেই টং করে বেজে উঠলো—প্রচণ্ড শক্ত সূতো। মহাশের তার মাছের ভাষায় চিৎকার করে উঠে জলের বিশাল এক আলোড়ন তুলে প্রচণ্ড রেগে দিঘির কোণ লক্ষ্য করে মারল ছুট। উপরে হুইলের তারস্বরে নিস্তব্ধ দুপুরের নিদ্রা গেল ভেঙে।

মহাশের যতই ছোটে, সূতোটা সমান টানে ছুটে আসে সঙ্গে—শক্ত টানও নয়, আলগাও নয়। এমন পাকা হাতে সে আর কখনও পড়েনি। প্রাণপণে ছুটোছুটি করেও কোনমতে মহাশের সে-বাঁধন খুলতে পারল না—ছেঁড়বার সুযোগও পেল না। তার শক্তি ক্রমে ক্রমে কমে আসতে লাগল।

এদিকে জলের মধ্যে সেই বিশাল আলোড়নে মহাশের-গিন্নি বুঝলে যে, মহাশেরের কোন বিপদ ঘটেছে। সে বুক দিয়ে বাচ্ছাকে আগলে নিয়ে বসে কাঁপতে লাগল। তার আর কিই বা করবার আছে? প্রাণী-জগতে ভবিতব্যকে মেনে নিতে হয়।

উপরে রজনীবাবু উত্তেজিতভাবে হুইলের সূতো গুটোতে লাগলেন। বিরাট মহাশের ভেসে উঠতে লাগল জলের ওপর স্থিরভাবে। দিঘির পারে তখন লোক জমে গেছে। মহাশেরের কালো শ্যাওলা-মাখা পিঠটায় রোদ চক্‌চক্ করে উঠতেই একটা কলরব উঠল—মহাশের! মহাশের!

এমন কি জমিদারবাবুও স্বয়ং দিঘির পাড়ে এসে উপস্থিত হলেন।

হুইলের টানে নির্জীবভাবে মহাশের কূলের কাছে এগিয়ে

আসতে লাগল। মাছটাকে এত স্থির দেখে জমিদারবাবু বললেন—আমার কিন্তু মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। মাছটা এত চুপ্‌চাপ্‌ কেন—যেন মরে গেছে!

রজনীবাবু বললেন,—হবে না? প্রায় দু-ঘণ্টা খেলেছে। কত আর শক্তি হবে?

জমিদারবাবু বললেন—হুঁ।

মহাশের স্থির ও নির্জীবের মত পড়ে থেকে নীরবে শেষ একটা প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করছিল। রজনীবাবু শিকার মুঠোর মধ্যে পেয়ে ভাবছিলেন, আর কি? হয়ে গেছে। মাছটা আর কূলের মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে। হুইলের একঘেয়ে আওয়াজ চলেছে—কর্‌র্‌র্‌…

হঠাৎ প্রচণ্ড শক্তিতে জলের ওপর থেকে একটা ছোটখাট পাহাড় যেন লাফিয়ে উঠল। সুতোয় পটাং করে একটা আওয়াজ হল। রজনীবাবু হুড়মুড় করে গিয়ে জলের মধ্যে পড়লেন।…

মহাশের তখন কোথায়? তার বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। সে তীরের মত নিচের দিকে নামছে সেই ফিকে হলদে, ফিকে সবুজ, ঘন সবুজ, কালো—গভীরতম কালো জলের স্তর ভেদ করে-করে। ভিজে জুব্‌ড়ি হয়ে রজনীবাবু যখন কূলে উঠে এলেন তখন জমিদারবাবুর কী হাসি!

—বলিনি আমি আগে? ওকে জালে ধরা যায় না, তুমি গিয়েছিলে ছিপে ধরতে!

হাতের শিকার ফসকে যাওয়ায় রজনীবাবুর জেদ একেবারে সপ্তমে চড়ে গিয়েছিল, বললেন—জালে ধরা যায় না?

—আমার ত তাই ধারণা হয়েছে—চেষ্টা করে দেখ।

তাই একদিন দুপুরবেলা আবার দিঘির জল আলোড়িত হয়ে উঠল। মাছ-মহলে পড়ে গেল মহা হুলুস্থুল। রাশি রাশি কালো-

কালো পা ধেয়ে এল দিঘির জলে। বিশাল এক জাল পড়ল দিঘিতে।

মহাশেরেরা তাদের সেই কালো গভীরতায় বসে লক্ষ্য করল মানুষগুলোর কাণ্ড; তারপরে তারা তাদের মাটির নিচের গহ্বরে ঢুকে গেল, যেখানে কোন মানুষের জাল পৌঁছতে পারে না।

জলের উপর চলছে বিশাল আলোড়ন। উপরের কোলাহল এখানে স্তিমিত মৃদু হয়ে পৌঁছয়, কিন্তু মহাশেরেরা নিশ্চিন্ত। মহাশের-গিন্নি বাচ্ছার গায়ে ল্যাজের মৃদু-মৃদু ঝাপ্‌টা মারতে মারতে নিশ্চিন্তে চোখ বুজল। এটা তার বিশ্রামের সময়। চঞ্চল বাচ্ছাটা ছট্‌ফট্‌ করে···কতক্ষণ বার হয়নি গহ্বর থেকে। আজ এখনি কেন তারা ঘুমের আড্ডায় ঢুকল মহাশেরের বাচ্ছা ভেবে পেল না।

তারপরে এক সময়ে হঠাৎ চোখ মেলে মহাশের-গিন্নি দেখল, বাচ্ছা পাশে নেই। মহাশের-গিন্নি চম্‌কে মহাশেরকে মারল এক ধাক্কা—বাচ্ছা কোথায় গেল? অ্যাঁ?

মহাশেরের চঞ্চল বাচ্ছা তখন জালের টানে পড়ে এগিয়ে চলেছে। উৎসুক শিশু একটুখানি ফাঁক পেয়ে বাইরে আসতেই এই বিপদ।

মহাশের বলল—এস শিগ্‌গির!

সেই প্রথম মহাশেরের পেছনে মহাশের-গিন্নি জাল তাড়া করে তীরের মত ওপরে উঠতে লাগল।

উপরে ইতিমধ্যে দু-বার জাল টানা হয়ে গেছে। মহাশেরের চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায়নি জালে। জমিদারবাবু হেসে বললেন—কি হে রজনী? কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। ওপরে তখন কোলাহল উঠেছে—মহাশের! মহাশের! সবিস্ময়ে সকলে দেখল, বিদ্যুতের মত বিশাল দুটো মহাশের একলাফে জাল ডিঙিয়ে জালের ভেতর টানে এসে পড়ল

রজনীবাবু বিজয়ীর হাসি হাসলেন।

দুটো জলের রেখা বিদ্যুৎগতিতে শির্‌শির্ করে কাঁপতে কাঁপতে জাল পিছনে ফেলে কূলের দিকে এগিয়ে এল। তারপরে ওপর-জলে মিলিয়ে গেল তাদের চিহ্ন।

রজনীবাবু জেলেদের উদ্দেশে হাঁক দিলেন—শক্ত করে জাল টেনে নিয়ে আয়। এবার বাছাধনেরা যাবে কোথায়?

জলের নিচে মহাশের তখন উল্টোদিকে রুখে দাঁড়িয়েছে। জালের বিরুদ্ধে লড়াই এই তার প্রথম। মহাশের-গিন্নি ঠিক তার পাশে এসে ভেসে দাঁড়ালো।

মহাশের বলল—নাও, এইবার!

তখন সেই অদ্ভুত ব্যাপার যদি তোমরা দেখতে পেতে—শুধু যদি চোখে দেখতে!

জাল শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে, নানারকম মাছের দল তার মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে।…কোথায় মুক্তি?…কেমন করে মুক্তি? মহাশেরের বাচ্ছা মাকে দেখতে পেয়ে প্রাণভয়ে ছুটে এসে তার ল্যাজের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। মহাশেরেরা জালের মাঝখানটা লক্ষ্য করে বাজের মত মারল ছুট। দুটো বিশাল টর্পেডো যেন আততায়ী জাহাজকে আক্রমণ করেছে। সে কী অদ্ভুত ভয়ঙ্কর তাদের গতি!

একদিকে জাল এগিয়ে আসছে, আর-একদিকে প্রচণ্ড গতিতে মহাশের দুটো ছুটেছে। বিরাট এক দুর্গের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে ছুটেছে দুটো পাগ্‌লা হাতী।

লাগল ধাক্কা। সেই গতিকে রুখতে পারে এমন সাধ্য কোন জালের ছিল না। মরীয়া দুটো মহাশের। একমুহূর্ত তাদের গতি বাধা পেলো। তারপরে বোমা ফাটার মত জাল ফটাং করে গেল ফেটে। তীব্র সেই গতিতেই মহাশের দুটো ও-পারে বেরিয়ে গেল।…ওপরে জেলেরা জলের উপরে চিৎপটাং!

রজনীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—কী হল? কি হল? হল কী?

জমিদারবাবু হেসে উঠলেন হো হো করে।

আজও আছে দিঘির কালো গভীর তলে তিনটে বিরাটকায় মহাশের; সেখানে সূর্যের আলো ঢোকেনা, জল সেখানে গম্ভীর, তরল, ঠাণ্ডা। আজও তারা নিস্তরঙ্গ বিশ্রামিত মধ্যাহ্নের ধূমায়িত দিঘির বুকে উঠে আসে, যখন জলের ওপর নুয়ে-পড়া ডালে বসে ফিঙে ল্যাজ দোলায়, চাতক 'ফটিক জল' করে করে রুক্ষ নীল আকাশে ঘুরে ফেরে, সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি ঝরে ঝরে গলে গলে পড়ে পৃথিবীর বুকে।...

আজও তারা স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, অতুলনীয়।

রঙিলা বৌ

কালশরীর বিলের জলে একটা রূপোলি ঢেউ শির-শির করে এগিয়ে এল। শরবনের শুক্‌নো শরে হাওয়া ঢুকে বাঁশির মত মধুর আওয়াজ স্বচ্ছ আকাশে কেঁপে-কেঁপে উঠে যাচ্ছে। কালশরীর বিল বিস্তৃত উদাস, মরুভূমির মত দিগন্তে ছড়িয়ে আছে। যতদূর দৃষ্টি চলে জল আর জল। জলার পূব গা ঘেঁসে বন ঘন সবুজ থেকে ঘনতর হতে-হতে কালচে সবুজ হয়ে অন্ধকারে মিশে গেছে। উষার ধূসর ছোঁয়াচ লেগেছে বনের মাথায়। নিস্তরঙ্গ জলার রূপোলি ঢেউটা শির-শির করে আসতে-আসতে শরবনে একটা সাপ হয়ে মিলিয়ে গেল। মাথার উপর উঁচুতে যাযাবর বুনো হাঁসের ডাকে পৃথিবী যেন চমকে ঘুম থেকে জেগে সূর্যের দিকে মুখ ফেরালো।

হাঁসেরা সব আসছে।

অনেক দল এসে পৌঁছে গেছে, আরও আসছে। দূর দূরান্ত দেশে শীতে জমে গেল হ্রদ, জলা, বাদা। সেখানে কুয়াশার সঙ্গে নামছে বরফ। হাঁসেরা তাই গরম দেশে এল চলে। গরম দেশে শীতটা কাটিয়ে গ্রীষ্মের আগেই তারা আবার ধরবে আকাশ-পথ। এখন শীতের কুয়াশাভরা আকাশ এখানে বুনো হাঁসের চিকণ ডানায় চিত্রিত হয়ে উঠল।

জলার ধারে শরবন থেকে জমিটা যেখানে ঢালু হয়ে উঠে গেছে, সেখানে সবুজ ঘাসে ঘন একটা জায়গা দেখে রঙিলা তার বাসা বেঁধেছে। রঙিলার বৌ দিনরাত ডিমের উপর বসে আছে। কচি কচি সাদা দুধের মত দুটো ডিম।

রঙিলা আকাশের দিকে চেয়ে বলল—দেখেছ, এখনও সব এসে

পৌঁছল না। আর দেরি হলে পথে ঠাণ্ডায় জমেই যে মারা যাবে! আমাদের এদিকে বাচ্ছাদের ফোটবার সময় হল।

রঙিলার বৌ বলল—ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে বাঁচি!

—কেন, এখানে আর ভয় কী?

—তা কি আর বলা যায়? চোখ-জ্বলা পেঁচাগুলোকে কিছু বিশ্বাস নেই। কোথা থেকে যে হতভাগা সাপের পো এসে আমার ডিম-বাছাদের মেরে খাবে কিছু বলা যায় না।

ডানা ফুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে রঙিলা গরব করে বলল—ওঃ, আসুক া একবার, ঠুকরে সেরে দেব না!

বৌ বলল—কত মুরোদ জানা আছে!

—তোমার একটুও ভরসা নেই আমার ওপর—রঙিলা জবাব দিল।

বাসা থেকে উঠে রঙিলা ডানাটা মেলে একবার ঝটপট করে ঠল, তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে রূপোলি স্বরে ডেকে উঠল -প্যাঁক প্যাঁক, পেঁ-য়া-ক!

তারপরে থপ-থপ করে সে নেমে এল জলার ধারে। জলার লে ঠোঁটটা লাগিয়ে সে যেন একবার জলের স্বাদটা দেখে নিল, রপরে আলগোছে নরম সাদা বুকটা জলের উপর ভাসিয়ে দিয়ে ছনে জলের শির্‌শিরে রেখা রেখে এগিয়ে গেল। জল এখানে ীর নয়। নিচে নরম কাদা-মাটি, মাঝে-মাঝে শালুক ফুটে ছে। টুপ্‌ করে গলাটা জলের ভেতর ডুবিয়ে দিল রঙিলা, পেছনে ছটা তার উঁচু হয়ে উঠল। এখানকার জলে অনেক শামুক গুগলি ওয়া যায়। নিশ্চিন্ত মনে রঙিলা তার প্রাতরাশ সেরে নিল।

আকাশে সূর্যদেবের সোনার মুকুট ঝলসে উঠেছে। বন থেকে সে আসছে অদ্ভুত সব শব্দ। দূরে-দূরে হাঁসেরা ভাসছে জলে। ঙলা ফিরল ডাঙার দিকে। গিন্নিকে তার খানিকটা ছুটি দিতে । সে সেরে নেবে প্রাতরাশ। ততক্ষণ ডিমের ওপর বসবে

সে। রঙিলা ভাসতে ভাসতে শরবনের গা ঘেঁসে ডাঙায় এসে লাগল। একটা মুহূর্ত। শরের গুচ্ছ চামরের মত রঙিলার মাথায় হেলে পড়েছে, শিরশির করে কাঁপছে মৃদু হাওয়ায়। রঙিলা ডাঙায় পা দিতে যাবে, কি যেন কিলবিল করে উঠল পায়ের নিচে। রঙিলা প্যাঁক্ করে ডেকে সরে যেতে গেল, কিন্তু সাপটা তখন জড়িয়ে গেছে তার পায়ে। ঝটপট করে রঙিলা গিয়ে ডাঙায় পড়ল আর তীক্ষ্ণস্বরে ডেকে উঠল—প্যাঁক, প্যাঁক!

একটা করুণ চিৎকার, সাপটা ছোবল মেরেছে রঙিলার সাদা বুকে! মৃত্যু-কাতর সে চীৎকার কেঁপে কেঁপে আকাশে উঠে বনের ভেতর মিলিয়ে গেল।

—পেঁ-য়া-ক্!

রঙিলা ঢলে পড়ল শরবনের কোলে। কালো সাপটা কিলবিল করতে করতে নেমে গেল। শরবনের শুকনো শরে বাতাস ঢুকে রঙিলার করুণ চীৎকার যেন উদাস জলার ওপর ছড়িয়ে দিতে লাগল।

বাচ্ছারা ফোটবার আগেই বাপকে হারাল তারা।

চিকির কাছে পৃথিবীটা ভারি সুন্দর এখন। হবে নাই বা কেন? ফুর্তিমাখা তার শরীর নরম তুলতুলে। সোনালি উজ্জ্বল চোখ, ধারাল নখ আর দাঁত। অনেক ভরসা তার মনে। সে এখন মা ছাড়াই বঁনে চলা-ফেরা করে বেড়াতে পারে। বনের কন্দরে কন্দরে কত নতুন বিস্ময়—চিকি অবাক হয়ে যায়। বুড়ো বেজিরা চিকির মাকে বলে—ছেলে এত বড় হল এখনও সাপ মারতে শেখালে না—একী?

চিকির মা হাসে, বলে—রক্তের তেজ যাবে কোথায়? ও শেখাতে হয় না, শত্তুরের সামনে পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে।

চিকি এখন টুকটুক করে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। বনে খাবারেরও ভাবনা নেই জিনিষেরও অভাব নেই, ভারি মজা। সেদিন

সকালে চিকি বন থেকে বেরিয়ে এল জলার দিকে। বন এখন কেমন যেন জীবন্ত। দলে দলে হাঁসেরা নেমেছে জলায়। হাঁসেদের সঙ্গে চিকির শত্রুতা নেই—তারা ত আর সাপ নয়! মা বলে দিয়েছে—খবর্দার চিকি, হতভাগা সাপগুলোকে কখন বিশ্বাস করিস নি! হাঁসেরা শান্ত নিরীহ। তাদের চলা-ফেরা, জলের ভেতর ডুব দেওয়া চিকির অদ্ভুত লাগে। চিকি এদিক-ওদিক চাইতে-চাইতে চমকাতে চমকাতে এগিয়ে চলে।

বেলা বয়ে যায়, রঙিলা এখনও ফিরল না। রঙিলা বৌ ডিমের ওপর বসে বসে ভাবল—ডিম ফোটবার সময় হল—তুল-তুলে নরম বাচ্ছা হবে, তার এখন কত কাজ! তবু জীবনটা ত রাখতে হবে! তারও ত কিছু খাওয়া দরকার, কিন্তু রঙিলার হুঁস নেই! সে বোধহয় এখন পেটুকের মত খেয়েই চলেছে। নাঃ, আর পারা যায় না!

রঙিলা বৌ উঠল। দেখা হলে এমন ধমক দেব যে বুঝিয়ে দেব মজা। ডানা ঝাপটে উঠে এল সে। থপথপিয়ে চলল জলার ধারে। হায় রে! সে ত আর জানে না যে রঙিলা আর ইহজগতে নেই! রঙিলা বৌ রাগ করে গলা ফুলিয়ে চলল জলার ধারে। সে জানে না যে ডিমগুলো একা ফেলে যাওয়ায় কী বিপদ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে! প্রকৃতপক্ষে, চিকি যদি সেদিন এদিকে না বেড়াতে আসত তা হলে!

—এদিকে সাপটা গন্ধে গন্ধে টের পেয়ে ডিমগুলোর লোভে এগিয়ে আসছিল। ঘাসের মধ্যে সর্ সর্ সর্! রঙিলা বৌ একবার চমকে উঠল। সাপটা তখন ঘাসের মধ্যে নিঃশব্দে স্থির হয়ে গেছে তাকে দেখে। মায়ের সামনে থেকে ডিম কেড়ে নিয়ে যেতে অতি বড় শক্তিশালী প্রাণীও ভয় পায়। কোথাও আর শব্দ না শুনে রঙিলা বৌ আবার এগোল জলার দিকে। সাপও এগোল তখন। হাঁসের বাসার কাছে সে প্রায় এসে পড়েছে।

কচি ডিমের লোভে জল ঝরছে তার চেরা জিভে—আর-একটু এগোলেই ব্যস !

কিন্তু সাপ আর এগোল না। গায়ের রক্ত তার হিম হয়ে গেল। সামনে একজোড়া সোনালি চোখ অদ্ভুত ভাবে চেয়ে আছে তার দিকে। চিরশত্রু বেজী সামনে, চুক্‌চুক্‌, চুক্‌চুক্‌ করছে তার লাল মুখ। সাপ ফণা ধরে ফোঁস করে গর্জে উঠল।

চিকি এর আগে কখনও সাপ দেখে নি। সাপের সামনে পড়ে সে অবাক হয়ে চেয়ে দেখল—ওঃ, এই সাপ ?

তার দৃষ্টিতে কোন রাগ নেই। স্থির বিস্মিত তার চোখ। কিন্তু সাপটা যেই ফোঁস করে গর্জে উঠল অমনি জন্ম-জন্মের অনুপ্রেরণায় তার রক্ত গরম হয়ে উঠল। কিন্তু চিকিকে স্থির দেখে সাপ ঝাঁ করে এক ছোবল মারল। বিদ্যুতের মত এক লাফে চিকি পেছিয়ে এল। ছোবল ফসকে সাপ আবার ফণা ধরে রাগে হিস্‌ হিস্‌ করতে লাগল। চিকি তখন যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাপটা দুলছে, সামনে চিকি পাথরের মত স্থির। সাপটা তাক্‌ করে মারল আবার ছোবল। সে ছোবল যদি গায়ে পড়ত তা হলে পৃথিবীর আলো চিকির ওইখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু চিকি বিদ্যুতের মত সরে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গে সাপটার মাথার ওপর দিয়ে চিকি মারল এক লাফ। সেই লাফের সঙ্গে সঙ্গে তার ধারালো নখের ঘায়ে সাপের মাথাটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

হিস্‌ হিস্‌—হিস্‌ হিস্‌।

সাপ মরীয়া হয়ে আবার ছোবল মারল, আবার চিকির লাফ, আবার সাপের মাথা ক্ষত-বিক্ষত। কিছুক্ষণ চলল এমনি। প্রতিটি ছোবলে চিকি সরে গিয়েই লাফ মারে আর তার নখের ঘায়ে সাপ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। একটু একটু করে সাপটা নির্জীব হয়ে আসতে লাগল, তারপর এক সময়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তার ফণা আর উঠল না শূন্যে। চিকির রাগ তখনও থামেনি। সাপটা

লুটিয়ে পড়তেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। তারপরে তার ধারালো দাঁতে সাপটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মুখে রক্ত মেখে চিকি ছুটে চলল বাসায়। চিকির মা গর্তের ধারে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল, তাকে দেখে চমকে বলে উঠল—ওমা এত রক্ত, কিসের?

—সাপ মেরেছি।

—সাবাস! বলে উঠল চিকির মা—তারপরে বুড়ো বেজীদের ডেকে সে বলল—কেমন, বলিনি যে শেখাতে হবে না? বুড়ো বেজীরা ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলল—ঠিক, ঠিক!

শরবনের ধারে জলার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে রঙিলা বৌ ক্রুদ্ধ স্বরে ডেকে উঠল—প্যাঁক প্যাঁক, প্যাঁ-অ্যা-ক!

এই ডাক রঙিলার অনেক চেনা ছিল একদিন। এই ডাককে সে ভয় করত, জানত বৌটি চটেছে। কিন্তু আজ কে সাড়া দেবে? রঙিলা বৌ একটু এগিয়েই দেখতে পেল তাকে। তার বুকটা ধ্বক করে উঠল। রঙিলা পড়ে আছে কেন—নড়েও না চড়েও না! ও তবে কি—? রঙিলা বৌ তার কাছে এগিয়েই চিৎকার করে উঠল। তারপরে চিৎকার করতে করতে পাগলের মত রঙিলার চারপাশে ছুটে বেড়াতে লাগল।

সাপের বিষে রঙিলা নীল হয়ে গেছে। দুঃখের প্রথম ধাক্কাটা কমতেই তার নীল রং নজরে পড়ল রঙিলা বৌএর। সাপে কামড়েছে! সে সাপটা কোথায়? তার বুক ভয়ে আবার ধ্বক্ করে উঠল। তার ডিমেরা যে খালি পড়ে আছে। দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে রঙিলা বৌ উঠল বাসার দিকে। হায় হায়, কী হল! কী হল!

পথে যেতে রঙিলা বৌ দেখল একটা মরা সাপ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বৌ এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, তারপরে তার বাসায় অস্ফুট কি একটা শব্দ শুনে সে আবার পাগলের মত বাসার দিকে এগিয়ে গেল।

অস্ফুট করুণ মৃদু একটা শব্দ—পিঁক পিঁক, পিঁক পিঁক!

বাসার সামনে এগিয়ে যেতেই রঙিলা বৌ দেখল, ডিম দুটো ফেটে তার মধ্যে থেকে দুটো রোঁয়াহীন কচি কচি গলা তার দিকে চেয়ে ডাকছে—পিঁক পিঁক, পিঁক পিঁক!

ভয়ের ঢেউ তার শরীর থেকে নেমে গেল। কচি-বাচ্চাদের সে ডাক রঙিলা বৌয়ের কানে যেন মধু ঢেলে দিল। সে ছুটে গিয়ে ডানা দুটো খুলে বাচ্চাদের আগলে চাপা দিয়ে বসল।

ময়ালের বন

দূর পাহাড়ের মাথায় হলদে রোদ। এ দিকটায় বড় বড় মোটা শাল, আসন, কাঞ্চন গাছের ভিড়। বুনো কলাগাছ দেখা যায় মাঝে মাঝে। জায়গাটা ঠাণ্ডা, ছায়াস্নিগ্ধ হিল্লোলিত বনময়। চমকানো চোখে নিঃশব্দে একটা বন-মোরগ ছুটে পালালো। দূর থেকে ভেসে যায় লঙ্গুর-বানরদের খেয়াল-খোলা আনন্দধ্বনি—কু-উ! উকু-উ! উকু উকু উক্কু!

এ-দিকটা ঠাণ্ডা, স্তব্ধ গম্ভীর। কান পেতে শোন, দূরে শুনতে পাবে কত রকমের রহস্যময় ভুতুড়ে বন্য শব্দ! কিন্তু এখানটা স্থির। লঙ্গুরেরা সাড়া না দিয়ে বনের এ কোণে ঢোকে না। গাছে গাছে বুনো কলার কাঁদি ঝুলে থাকে। মধুর লোভে ভালুক আসে না এ ধারে অন্ততঃ হুকুম না নিয়ে। খেঁকশিয়াল আর বন-বিড়াল এড়িয়ে চলে এধার; এমন কি, ঈগলও এখানে ছোঁ-মারার আগে ডেকে জানিয়ে দেয় যে সে এই বনে শিকার করতে চায়। অথচ বনের এ-কোণটায় মৌমাছিরা গড়ে চাক, বন-মোরগেরা খেলা করে, মাটির ঢিপিতে অসংখ্য ফুটো করে করে বেড়ে চলে খরগোসের পাল।

সেদিন কিন্তু একটা অসম্ভব ঘটনাই ঘটে গেল! কোথা থেকে একটা লঙ্গুর-বানরের বাচ্ছা এসে যেন লঙ্কা-দাহন শুরু করে দিল জায়গাটায়! হুপ্‌ হুপ্‌ করে এ-গাছে ও-গাছে লাফায়, কলার কাঁদিগুলো ভাঙে, কিছু খায়, কিছু মাটিতে ছোঁড়ে। একবার লাফিয়ে নামে মাটিতে, আবার উকু-উকু-উক্কু ডেকে উঠে, ছুটে লাফিয়ে গাছে চড়ে, আবার নামে। এদিকের শান্ত ঘুমন্ত বনে সে এক মহা হৈ-চৈ!

তারপরে একবার মাটিতে নেমে হঠাৎ জমে গেল লঙ্গুর-বাচ্ছা। তার কিছু দূরেই যেন এক জোড়া মরকত মণির সবুজ আগুন জ্বলছে আর সেই আগুনটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাকে। সে নড়তেও পারছে না, পালাতেও পারছে না। স্থাণুর মত অনড় বসে সে দেখল, একটা অতিকায় সরীসৃপ হড়কে এগিয়ে আসছে তার দিকে। আসলে সে-দুটো মরকত মণি নয়—প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপের একজোড়া ঠাণ্ডা জ্বলন্ত চোখ!

ময়ালের মাথাটা লঙ্গুরের অল্প দূরে এসে ঘাসের মাঝে থেমে গেল। একটা ঠাণ্ডা শিহরণ অনুভব করল লঙ্গুর-বাচ্ছাটা। তার-পরে হিস্ হিস্ করে ময়ালটা বলল,—যে পায়ের শব্দ ওঠে না, যে চোখ আঁধারে জ্বলে, যে কাণে দূরের বাতাস খবর বয়ে আনে, সে-ই শুধু বনের রাজা হওয়ার উপযুক্ত। জানিস লঙ্গুর-বাচ্ছা, রাজা আমি, তোকে আজ আস্ত গিলে ফেলব।

লঙ্গুর-বাচ্ছাটা তখন সত্যি-সত্যিই ঠক-ঠক করে কাঁপছে!

লঙ্গুর-সর্দার শেখায় নি তোকে যে বনের শিকারীকে চমকে দিতে নেই? শিকারী চমকে গেলে তখন আর জ্ঞান থাকে না, যাকে সামনে পায় আক্রমণ করে বসে। না হলে বাচ্ছা জানোয়ারকে সহজে শিকার করে না কোন শিকারী, শুধু সেই হতভাগা কেঁদো বিড়ালগুলো ছাড়া।

তার চোখের মোহময় আকর্ষণ কমিয়ে আনল ময়াল। বলল সে,—যা লঙ্গুর-বাচ্ছা, তোকে আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এই বুড়ো ময়ালের কাছ থেকে শিখে নে যে, সব জানোয়ারের একটা একটা ডেরা আছে বনে। কারো এলাকায় কাউকে ঢুকতে হলে জানিয়ে দিয়ে ঢুকতে হয়। নেকড়েরা শিকার করার আগে ডেকে জানিয়ে দেয়—শোন বনবাসী, আমাদের খাদ্য চাই; এই বনে শিকার করব আমরা।

যদি জবাব আসে—পেট ভরাবার জন্যেই শিকার কর, মারার

আনন্দে নয়, তবেই নেকড়েরা শিকারে নামে। সব শিকারী জানোয়ারেরই ওই ধুয়ো। এমন কি ভাল্লুক যখন মৌচাক ভাঙে, সেও মৌমাছিদের মিষ্টি কথায় বলে নেয়—কিছু মনে কোরো না ভাই। তোমাদের চাকটা ভাঙতে হবে, ক্ষিধে পেয়েছে। তার বদলে অবশ্য তোমরা যত খুশি হুল ফুটোতে পার।

ময়াল হিস্ হিস্ করে হেসে উঠে—ভাল্লুকের লোমওলা গায়ে হুল ফুটিয়ে মৌমাছিরা করবে কী? শুধু বনের এই ভদ্রতা মানে না কেঁদো-বিড়াল—বাঘ। সে মনে করে সে এই বনের রাজা, সব নিয়মের উপরে; যখন-তখন যেখানে-সেখানে শিকার করলেই হল। কিন্তু একদিন দাম দিতে হবে ওই কেঁদো-বিড়ালটাকে!

ময়াল মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। তিন লাফে অতি-সাহসী লঙ্গুর-বাচ্ছা ময়ালের বন ছেড়ে গাছের ডালে ডালে মিলিয়ে যেতে থাকে।

কালো বাঘটার মখমল-জোড়া পায়ে কোন শব্দ ওঠে না, অথচ পেশীতে তার সে কী দ্রুত গতি! বনের পর বন অতি অল্পক্ষণেই পার হয়ে যায় সে। আর যেখানে শিকার—সে যে-জানোয়ারের এলাকার মধ্যেই হোক না কেন,—নিঃশব্দে আক্রমণ করে সে। সে জানে যে সে বাঘ বনের রাজা।

কিন্তু সেদিন হল কী, বন থেকে যেন শিকার উপে গেল! যে বনেই যায় বাঘ, কোথাও শিকার নেই! এর একটা কারণ ছিল। বনের নিয়ম ভাঙায় বনের সব জানোয়ার বিরক্ত হয়ে উঠেছিল বাঘের উপর। তাই আকাশের চিল সেদিন প্রহরীর কাজ করছিল। বাঘ তার নিজের ডেরা থেকে সেদিন বার হওয়ামাত্র আকাশ থেকে একটা চিল ডেকে উঠল:

—কি-ই কিরকি—কি!

নীল আকাশের আর-এক প্রান্ত থেকে আর-একটা চিল লুফে

নিল তার ডাক : কি-ই কিরকি-কিরকি-কি! কেঁদো-বিড়াল যায়, সাবধান! সাবধান!

বেলা বেড়ে চলে। পলাশের দল বনের মাথা রাঙিয়ে তুলেছে, সূর্যের আলো সেই লালে পড়ে সোনা হয়ে ঠিকরে যাচ্ছে। বুনো কুচো ফুলের গন্ধে বাতাস ভরপুর।

কিন্তু শিকার কোথায়? ক্ষিধেয় মাতাল হয়ে উঠেছে কালো বাঘ—আর কতদূর? এত মাটি মাড়িয়ে এল সে, একটাও শিকার নেই?

দীর্ঘ আসন গাছটার একটা ডালে পা আটকে মাথা নিচু করে চোখ বুজিয়ে ছিল বাদুড়দের সর্দার সিং। সূর্যের রশ্মি তখন প্রখরতর। তীক্ষ্ণ আলো চোখে সয় না বাদুড়দের। চোখ বুজিয়েই সিং বলে, কেঁদো-বিড়ালটা আসছে!

ময়াল ধীরে ধীরে কুণ্ডলীর পাক খুলতে লাগল। আর কালো বাঘ চলার পথে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। ওই তো সামনে রসাল খাদ্য —নরম সাপের মাংস অজস্র! ক্ষিধেটা আজ মিটবে ভাল।

বন কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে লাফালো বাঘ ময়ালকে লক্ষ্য করে। একটুও নড়ল না ময়াল। আর কালো বাঘ যখন লাফিয়ে পড়েছে তার মাথায়, তখন তার দীর্ঘ শরীরের অবশিষ্ট অংশ ফাঁসের মত গোল হয়ে নিঃশব্দে পাকিয়ে ফেলল কালো বাঘটার শরীর।

এক পাক, দু-পাক, তিন পাক, চার পাক! ময়ালের মাথার দিকটা মড়ার মত নিশ্চল। ওদিকে বাঘ তখন প্রথম কামড়টা বসিয়েছে, এমন সময়ে সব নিঃশব্দে নিংড়ে বেরিয়ে এল তার শরীর থেকে।

ময়ালের পাক তখন সজোরে চেপে বসতে শুরু করছে। ভয়ে আর্তনাদে চীৎকার করে উঠল কালো বাঘ।

ময়াল হিস্ হিস্ করে বলল,—রাজা ভাবলেই রাজা হওয়া যায় না। যে পায়ে শব্দ ওঠে না, যে চোখ আঁধারে জ্বলে, যে

কাণে দূরের বাতাস খবর বয়ে আনে, যে শিকারী অন্য শিকারীকে সম্ভ্রম করে চলে, সে-ই শুধু বনের রাজা হওয়ার উপযুক্ত।

ময়ালের পাক দৃঢ়তর হলো। আর একটা শেষ আর্তনাদ করে উঠল কালো বাঘ।

কি-ই-ই কিরকি কি !

চিলের ডাক নীলে-ঝলসানো আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে চমকে চমকে যেতে লাগল—

—ই-ই, কিরকি-ই !

একটা চলে-যাওয়া দিনের গুরুতর কাহিনী

নিজের নাম নিয়ে শেষে এমন মুস্কিলে পড়ব কে জানত? শেক্সপীয়র বলে গেছেন, নামেতে কী আসে যায়? আমার মামা আমার বেলায় মহাপুরুষের সেই মহাবাক্য প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ যে-কোন বিশেষ্য বা বিশেষণ যা তাঁর বেশ লাগসই মনে হয় তা তিনি আমার ওপর লাগিয়ে বসেন। তাই তাঁর কাছে কখনো আমি পেঁচা কখনো গরু কখনো ভাল্লুক আবার কখনো দোল-গোবিন্দ বলেও আখ্যাত হই। আমার মেসোমশায়ের কিন্তু অন্য মত—তিনি আবার মস্ত মনস্তত্ত্ববিদ। তিনি বলেন, নামের ওপরেই এক-এক জনের মনস্তত্ত্ব ফুটে ওঠে—নামই সব। বাপ-মা যা নাম দেয় সে সব ভুল, তার ভেতর থেকে চরিত্রের কোন আভাস পাওয়া যায় না; তাই যে-সব লোকের সংস্পর্শে তিনি আসেন, তাদের সকলকে তিনি নিজে এক-একটা নাম দেন। আমার কপালে জুটেছিল—হরির লুঠ।

তারপরে আমার পিসেমশাই। তিনি অত যুক্তি-তর্কের ধার ধারেন না। তাঁর পরিচয় তোমরা শিগ্‌গিরই পাবে, তবু আগে থাকতে এটুকু জেনে রাখ যে তিনি রসোগোল্লা খেতে অত্যন্ত ভালবাসেন, আর রসোগোল্লা কথাটা সব সময়ে তাঁর মুখে লেগে আছে। আমার পিসেমশাই পয়সাওয়ালা লোক, কিন্তু তেজারতি ব্যবসা করে তাঁর প্রকৃতিটা বেশ কৃপণ হয়ে উঠেছিল। সদানন্দ রোডে প্রকাণ্ড এক পাঁচতলা বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে তিনি থাকতেন। মোটের ওপর সবই চলছিল ভাল, কিন্তু গোলমাল বাধালে একছড়া প্রকাণ্ড মোটা সেকেলে সোনার বিছে হার।

সেদিন সকালে তখন সবে বিছানায় উঠে বসেছি, হঠাৎ মামা হন্ত-দন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই বললেন,—এই দেখ ঠিক যা ভেবেছি, পেঁচাটা ঘুমোচ্ছে।

—কই মামা ঘুমোচ্ছি কোথায়, এই তো উঠে বসে আছি।

—তবে তো খুব কাজ করেছ! নে নে, চল্!

—কোথায়?

—শুনিসনি, তোর পিসেমশায়ের বাড়ি যে ভীষণ চুরি হয়ে গেছে!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ রে ভাল্লুক, চল্ শিগ্গির, চল্।

একবার মামার দোকানের একটা মুক্তোর মালা চুরির চোর ধরায় সাহায্য করেছিলাম বলে মামার কাছে আজও আমার খুব খাতির। আমার মামা জুয়েলার আর পিসেমশাই তেজারতি করেন, তাই ওদের দুজনের মধ্যেও খুব খাতির।

মামার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম—পথে যেতে যেতে মামা আমাকে চুরির সমস্ত ব্যাপার খুলে বললেন।

পিসেমশায়ের বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটে তেতলায় সম্প্রতি এক বেহারী ভদ্রলোক ভাড়াটে এসেছেন। কাল রাত্রে সেই ভদ্রলোক পিসেমশায়ের কাছে এসে বলেন—বাবুজি আমি নূতন কলকাতায় এসে টাকার অভাবে বড় বিপদে পড়ে গেছি, শুনলাম আপনি টাকা ধার দেন। তা আমার এই হারটা বাঁধা রেখে যদি আপনি পাঁচশো টাকা ধার দেন তো বড় উপকার হয়।

অবশ্য কথাগুলো সব হিন্দীতেই হয়েছিল।

পিসেমশাই হারটা পরীক্ষা করে দেখলেন একেবারে পাকা সোনার দামী হার। তবু বললেন—আপনি কাল আমার দোকানে আসবেন, দিয়ে দেব। তখন সে ভদ্রলোক বললেন—বাবুজী আমার হাতে একটা পয়সা নেই; আজই যদি আপনি দেন ত বিশেষ উপকার হয়! এখন, সেদিন কি কারণে পিসেমশায়ের হাতে টাকা

ছিল, তিনি হারটা নিয়ে টাকাটা দিয়ে দেন। তারপরে হারটা তাঁর সেকেলে লোহার সিন্ধুকে তুলে রেখে যথারীতি কাজ-টাজ সেরে তিনি শুয়ে পড়েন। লোহার সিন্ধুকটা থাকত পিসিমার ঘরে, পিসিমা কিছুদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। পিসেমশায়ের শোবার ঘর তার পাশে। সকাল বেলা তিনি উঠে দেখেন, পিসিমার ঘরের বারান্দার দিকের দরজা খোলা। তাঁর কি রকম সন্দেহ হয়। উঠে এসে দেখেন, সেকেলে লোহার সিন্ধুকের ডালা ভাঙা পড়ে আছে, ভেতরে কিছু নেই। আর বারান্দা থেকে বাঁধা একটা লম্বা দড়ি নিচে মাটিতে ঝুলছে। সিন্ধুকে আর কিছু বিশেষ ছিল না, কিছু টাকা আর সেই হারটা। সব উধাও। পিসেমশাই প্রথমে টেলিফোন করে মামাকে জানান, তারপরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে সব লিখে-টিখে নিয়ে বলে যে এইরকম সিন্ধুক-ভাঙা চুরি কয়েকদিন ধরে অনেকগুলো হয়েছে কিন্তু চোরকে তারা কিছুতেই ধরতে পারছেনা।

এই ত গেল সংক্ষেপে ব্যাপার, তারপরে মামা আমার কাছে আসেন। পিসেমশায়ের ওখানে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় ন-টা হবে। বাড়িতে ঢোকবার প্যাসেজের সামনেই রামসিং দরোয়ানের ঘর। ফ্ল্যাট হিসেবে ভাড়া দেওয়া কিনা, তাই রামসিং বাড়ির তাঁবেদারি করে। আমাদের দেখে রামসিং বেরিয়ে এল। ইয়া তাড়া লম্বা চেহারা, বুক পেট সব সমান গোল আর মুখে বিশাল এক ঝাড়ুদারি গোঁফ। মামাকে দেখে রামসিং বলল—কি বাবুজী, ডাকু পাকড়াবার জন্যে কি এই খোঁকাবাবুকে নিয়ে এলেন নাকি ?

মামা বললেন—হ্যাঁ।

রামসিং হো হো করে হেসে উঠল। তারপরে আমার কাঁধের ওপর তার বিশাল হাতটা রেখে বিড়াল যেমন করে ইঁদুরকে ঝাঁকুনি দেয় তেমনি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—খোঁকাবাবু পালোয়ান, ডাকু পাকড়্কে লিয়ে আসবে।

রামসিং আবার হো হো করে হেসে উঠল। আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল, তবু রামসিংএর চোখে একটা অদ্ভুত লোভী আলো দেখে চুপ করে গেলাম। এরকম ব্যাপারে যত চুপ করে দেখা যায় ততই ভাল!

উপরে গিয়ে দেখি, পিসেমশাই একটা ইজি চেয়ারে উদাস হয়ে পড়ে আছেন। আমাকে দেখেই হাঁউমাউ করে উঠলেন—এই দেখ রসোগোল্লাটা এই সময় জ্বালাতে এসেছে! আমি মরছি, আর এখন হল ওর মজা দেখবার সময়! ওরে, উঃ, আমার বুক কেমন করছে!

মামা বলল—ওরকম করছ কেন? চুপ কর।

—চুপ করব? আমার মান-সম্মান সব গেল! দেওনারায়ণের কাছে মুখ দেখাব কি করে?

দেওনারায়ণ সেই বেহারী ভদ্রলোকের নাম।

মামা বললেন—কী আর হয়েছে? না-হয় টাকাটা তুমি দিয়ে দেবে—

অ্যাঁ! ওরে বাবা হা—জা—র টাকা! পিসেমশাই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন—ওরে আমার বুক কেমন করছে, বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠেছে! ওরে রসোগোল্লা ডাক্তার ডাক্।

আমি মামার মুখের দিকে তাকালাম। মামা বললেন—যা-রে শুঁটকি-মাছ, তোর মেসোমশাইকে একবার খবর দে।

মেসোমশাই আত্মীয়দের সকলেরই ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান—ভিজিটটা বেঁচে যায় কি না!

একটু পরে দুমদাম করে এসে মেসোমশাই ঘরে ঢুকলেন, কাঁধে এক প্রকাণ্ড ঝুড়ি। আমরা ত অবাক! জিজ্ঞেস করলাম,

—ওতে কী মেসোমশাই?

—কমলা লেবু।

—কমলা লেবু কী হবে?

—উঃ উঃ, কী বোকা রে! কমলা লেবু কী হয়? নে নে, একটা খেয়ে ছাখ্ কি হয়।

—তা তো জানি। কিন্তু নিজে কাঁধে করে নিয়ে এলেন, এর মানে কী?—এগুলো পিসেমশায়ের জন্য বুঝি?

—অ্যাঁ? না, না, বুকের ব্যামো—ও লেবু খাবে কি? আর নিচে গাড়িতে রেখে আসার কি জো আছে? ড্রাইভারটা যদি খেয়ে নেয়?

ভেবে দেখ তোমরা, প্রকাণ্ড মাস্টার-বুইকে যিনি ঘুরে বেড়ান, তাঁর ভয়—একটা লেবু যদি ড্রাইভার খেয়ে নেয়। আবার জিগেস করলাম—তা লেবু খেলে তো শুনেছি হার্ট শক্ত হয়, পিসেমশায়ের বেলা কি সে নিয়ম খাটে না?

—অ্যাঁ? আচ্ছা দে আধখানা।

তারপরে পিসেমশায়ের দিকে ফিরে বললেন—এইবার বল তো টেঁশুরাম কেমন আছ?

পিসেমশাই লাফিয়ে উঠলেন—টেঁশুরাম কাকে বলছ?

—কেন, তোমাকে! আমি ভেবে দেখলাম ওই নামটাই তোমার মনস্তত্ত্বের সঙ্গে চমৎকার মানায়। একেবারে যেন খাপে খাপে বসে যায়, কি বলিসরে হরির লুঠ? আমার দিকে ফিরে মেসোমশায় বললেন।

আমাকে আর উত্তর দিতে হল না। পিসেমশাই তখন উঠে বসেছেন, তাঁর বুকের ব্যথা তখন ভাল হয়ে গেছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—আমি টেঁশুরাম? তা হলে তুমি—তুমি একটা (পিসেমশাই কথা খুঁজতে লাগলেন)…তুমি একটা রসোগোল্লা!

—খামোখা কেন রাগ করছ? মেসোমশাই বললেন। তারপরে মামার দিকে ফিরে জিগেস করলেন—আচ্ছা তুমিই বল গদাধর?

—গদাধর কাকে বলছ? বাজখাঁই গলায় উত্তর এল।

—কেন, তোমাকে! ওটা তোমার নাদা পেটের সঙ্গে যা মানায়, চমৎকার!

কী? কী বললে, আমার নাদা পেট?

তারপরে যা কাণ্ড শুরু হল ঘরের ভেতর, সে আর বলবার নয়। কাকে রেখে কাকে সামলাই! ঘরের ভেতর বেশ কথার কুরুক্ষেত্র বেঁধে গেল। আমি শেষে চটে-মটে বললাম—আপনারা তাহলে এই করতে থাকুন, আমি চললাম।

রাগ করে পথে নেমে এলাম। তিনজন বয়স্ক লোক, তাদের এ কী কাণ্ড! সকাল বেলাটাই আমার নষ্ট হল দেখছি! আর হঠাৎ পেছন থেকে পিসেমশায়ের চীৎকার শুনলাম—এই রসোগোল্লা!

সঙ্গে সঙ্গেই মেসোমশায়ের ডাক—হরির লুঠ! দেখি সামনের বারান্দায় পিসেমশাই আর মেসোমশাই দুজনেই বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকছেন—

—রসোগোল্লা!

—হরির লুঠ!

—রসোগোল্লা!

—হরির লুঠ!

কী আর করি, ফিরলাম। কিন্তু এ কী বিপদ, আমার পেছু পেছু এত লোক আসে কেন? দেখতে দেখতে পথটা লোকে ভরে গেল আর সবাই পিসেমশায়ের বাড়ির সামনে এসে জড় হল। একজন হেঁকে বলল—কই মশাই, রসোগোল্লা হরির লুঠ কোথায়?

পিসেমশাই আমাকে দেখিয়ে বললেন—না সে আপনাদের নয় মশাই, ওই ওকে।

—কেন আমরা বুঝি খেতে জানিনা? হরির লুঠ দেবেন তার আবার একে-ওকে কী?

মেসোমশাই আমাকে ডাকলেন—এই হরির লুঠ!

—কই মশাই কই? শুধু-শুধু লোককে মিথ্যে কথা বলেন কেন?

—আপনাদের বলছি না মশাই।

—বলছেন না কি রকম? হরির লুঠ বলে আকাশ ফাটিয়ে ফেলেছেন, আসলে শূন্যি?

কতক্ষণ এরকম চলতে বলা যায় না কিন্তু সব থেকে বাঁচাল মামা, আমার ওপর মামার জীব-জগতের জ্ঞান-প্রয়োগ এতদিনে দেখলাম সার্থক হল। মামা হঠাৎ বারান্দায় বেরিয়ে এসে আমাকে হেঁকে বললেন—এই ডালকুত্তা, তেড়ে যা না, হাঁ করে দেখছিস কী?

ভিড়ের মধ্যে কে যেন বলল—অ্যাঁ, ডালকুত্তা! তারপরেই সব হাওয়া।

ওপরে এসে বললাম—আপনারা কি সারাদিন আজ এই করবেন, না চুরির ব্যাপারে কিছু বলবেন?

মামা বললেন—ব্যাপারে আর কী বলবার আছে? একটা চোর দড়ি বেয়ে এই বারান্দায় উঠেছে, কোন যন্ত্র দিয়ে দরজা খুলেছে তারপরে সিন্ধুক ভেঙে লোপাট।

পিসেমশাই শুধু একবার হাঁউ-মাউ করে উঠলেন।

আমি বললাম, যন্ত্র দিয়ে দরজা খুলেছে কী করে জানলেন?

—প্রথম, যে চোর সিন্ধুক ভাঙতে পারে সে দরজাও ভাঙতে পারে; দ্বিতীয়, দরজায় একটা নূতন বড় করে ছেঁদা করা হয়েছে।

--আচ্ছা পিসেমশাই, আপনার সেই ভদ্রলোক সেই হারটার কথা বা টাকার কথা ওই রামসিং দারোয়ানকে বলেছিল কিনা জানেন?

—না তা তো জানি না, তবে ডেকে জিগেস করতে পারি।

—হ্যাঁ করুন না একবার।

দেওনারায়ণ বাবুকে আনা হল।

মামা বললেন—এই প্যাঁচা, কী জিগেস করবি তুই কর।

আমি জিগেস করলাম—আচ্ছা আপনি আপনার হারটা কি রামসিংকে দেখিয়েছিলেন বা বন্ধকের কথা বলেছিলেন ?

ভদ্রলোক ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পিসেমশাই বললেন—ও, উনি আবার বাংলা ভালো বোঝেন না। আচ্ছা, সব আমি জিগেস করছি।

অনেকক্ষণ ইকড়ি-মিকড়ি করার পর জানা গেল হারটার কথা। দেওনারায়ণ বাবু রামসিংকে বলেওছিলেন, দেখিয়েও ছিলেন ; এবং বন্ধক দিয়ে যে টাকা নিয়েছিলেন সে কথাও বলেছিলেন। এক দেশের, আর এক ভাষার লোকের কাছে অত লুকোচুরি করবার দরকার মনে করেন নি।

দেওনারায়ণ বাবু চলে গেলে মামা বললেন—কেন ? রামসিংএর কথা জিগেস করছিস কেন ?

আমি বললাম—হারটার কথা দুজন লোকের মোটে জানবার কথা—এক দেওনারায়ণ, দুই পিসেমশাই। তৃতীয় যদি কেউ জানে তাহলে সন্দেহটা তার ওপর পড়ে। এখন এটা সাধারণ চোরের কাজ নয়, কারণ ঠিক হারটা যেদিন রাখা হল চুরিও সেদিনই হল। এর মধ্যে একটা যোগাযোগ রয়েছে। এ কোন জানা চোরের কাজ।

পিসেমশাই লাফিয়ে উঠলেন—ঠিক হয়েছে, নিশ্চয় ওই ব্যাটা রামসিং নিয়েছে। আমার এখানে যে আর কিছু থাকে না, সব দোকানে থাকে, ও জানে। কাল শুনেছে হারটা ওখানে রেখেছি, ব্যাটা দড়ি বেঁধে ওপরে উঠেছে তারপর দরজা কেটে সিন্ধুক ভেঙে চুরি। দাঁড়াও দেখাচ্ছি ব্যাটাকে।

—দাঁড়ান দাঁড়ান পিসেমশাই, এখনই নয়।

—কেন ?

—আগে ভাল করে দেখা যাক। চলুন ত বারান্দাটা দেখি একবার।

বারান্দায় এসে আমি বললাম—দড়িটা কোথায় গেল ?

—পুলিশ নিয়ে গেছে।

—দড়িটা কোথায় বাঁধা ছিল ?

মাসীমা আর পিসেমশাই দেখিয়ে দিলেন, মেসোমশাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেবু খেতে লাগলেন।

বাড়িটা প্রকাণ্ড লম্বা। সামনে তু-সার ছোট-ছোট ব্যালকনি ওপরে উঠে গিয়েছে, আমাদের মাথার ওপর আমাদের মতই ব্যালকনি আরও চারটে ওপরে ওপরে উঠে গেছে। ব্যালকনিগুলো ঢালাই করা, তার উপর বালির কাজ। দেখলাম যেখানে দড়িটা বাঁধা ছিল বলে ওঁরা দেখিয়ে দিলেন সেখানে কোন দাগ নেই, চূন-বালির ওপর কোন রকম দাগ পড়েনি। একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

সেদিন আর কিছু হল না, চলে এলাম। মনটা চিন্তিত হয়ে রইল। পথে যেতে যেতে ভাবলাম, একটা দড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল অথচ রেলিংএর চূণ-বালিতে কোন দাগ পড়ল না ? লোকটা কি পাখির মত হালকা নাকি ? লোকটা দড়ি বেঁধে তো উঠেও এসেছে। তাতে চূণের ওপর অনেক ঘসা লাগবার কথা। হঠাৎ বিত্যুতের মত একটা কথা মনে চমকে গেল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম চোর দড়ি বেঁধে ওপরে উঠে চুরি করেছে। বারান্দায় দড়ি বাঁধল কী করে ? চোরের ত আর পাখা থাকতে পারে না, আর থাকলে সে দড়ি ব্যবহার করবে কেন ? হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার !

সন্ধেবেলা আবার পিসেমশায়ের ওখানে গেলাম, গিয়ে দেখি বাড়ি অন্ধকার কুপ-কুপ করছে। সিঁড়ির মুখে রামসিংকে জিগেস করলাম—এত অন্ধকার কেন ?—ডাকু পকড়নেকা সুবিস্তা হোগা আপকা খোঁখা বাবু! রামসিং হো হো করে হেসে উঠল তারপরে বলল—নেই খোঁখা বাবু, বিজলি লাইন ফিউজ হো গিয়া, মিস্ত্রী আতা হায়।

আর কিছু না বলে ওপরে উঠতে লাগলাম আর হঠাৎ সিঁড়ির বাঁকে লাগল ঠোক্কর কার সঙ্গে—আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে উঠল—কি মশাই দেখতে পান না? অন্ধ নাকি?

একটা কড়া জবাব দিতে যাব, হঠাৎ লোকটা প্রায় ছুটে নেমে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কে লোকটা? অমন করে পালাল কেন? তাড়াতাড়ি পিসেমশায়ের ঘরে ঢুকতেই পিসেমশাই বলে উঠলেন—কি রে রসোগোল্লা, কী মনে করে?

দাঁড়ান—বলে ছুটে বারান্দায় গিয়ে দেখি, বাড়ি থেকে দেওনারায়ণ বেরিয়ে যাচ্ছে। লোকটা একবার সন্দিগ্ধ ভাবে ওপরে তাকাল তারপরে হন হন করে পা চালিয়ে দিল।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! ওর সঙ্গেই যে আমার ধাক্কা লেগেছিল এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না, কিন্তু ও নাকি বাংলা জানে না? এ লুকোচুরির মানে কী? প্রথমতঃ ও মিথ্যে কথা বলেছে বাংলা জানে না বলে, দ্বিতীয়তঃ বাংলা বলে ফেলে ওরকম লুকিয়ে পালাতে যাচ্ছে—এর মানে কী? আর হঠাৎ সত্যিটা মনে চমক দিয়ে গেল।

হারটার কথা তিনজন জানত। পিসেমশাই, দেওনারায়ণ আর রামসিং! এখন, রামসিং নিচে থেকে ওপরের বারান্দায় দড়ি বাঁধতে পারে না। পিসেমশাইকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। তা হলে থাকে দেওনারায়ণ। সে তার বারান্দা থেকে দড়ি বেঁধে নেমে এসে হারটা চুরি করেছে তারপরে ওঠবার সময় দড়ির নিচের দিকটা পিসেমশায়ের বারান্দায় বেঁধে, আবার ওপরে উঠে গেছে। তারপরে নিজের বারান্দায় থেকে দড়িটা খুলে একেবারে নিচে ফেলে দিয়েছে। কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারেনি। তার দু-রকম লাভ, টাকাটাও, হারটাও। আর তাই আমরা নিচের বারান্দায় কোনরকম দড়ির দাগ দেখতে পাইনি। আমি ছুটে ভেতরে এলাম —পিসেমশাই, আপনার থানার ইনস্পেক্টরের সঙ্গে ভাব আছে?

—কোন্ ইনস্পেক্টর ?

—যে এই চুরির খোঁজ নেবার ভার নিয়েছে ?

—না, তবে তোর মামার সঙ্গে তার ভাব আছে।

—তবে ডাকুন মামাকে।

আধঘন্টা পরে মামা এসে বলল—কী রে গরু, আবার কী খেয়াল ?

—মামা, ইনস্পেক্টরকে একটা খবর দিতে হবে। খবরটা ঠিক কি না জানি না, তবে মনে হয় আমার সন্দেহ ঠিক।

—খবরটা কী ?

পিসেমশাই বললেন—রসোগোল্লা।

—অ্যাঁ রসোগোল্লা ? সে আবার কী?

—আঃ, আপনারা আবার শুরু করবেন না, আমি বললাম, দাঁড়ান সব বলছি।

সেই রাতেই ইনস্পেক্টর বিজয়লালবাবু এসে দেওনারায়ণকে বললেন, বাবুজী আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। একবার আসতে পারি ?

—জরুর ! দেওনারায়ণ জবাব দেয়।

আমরা বিজয়লালবাবুর পেছনে ভেতরে যাই এবং কোন কথা না বলে একেবারে বারান্দায় গিয়ে হাজির হই। বেশী খুঁজতে হয় না, বারান্দার চুনবালির রেলিংএর হাতলে গোল করে কাটা কাটা দাগ। বিজয়বাবু হেসে ওঠেন, তারপরে আমাকে বলেন—সাবাস ভায়া ! ওই দড়ির দাগ, ওইখান দিয়ে ও নিচে নেমেছিল।

পিসেমশায় লাফিয়ে ওঠেন—উঃ উঃ, সাহস দেখেছ ! হতভাগাকে জেলে দেব, হতভাগা একটা....একটা....একটা রসোগোল্লা ! আমরা ভেতরে আসি, আর আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠি—দেওনারায়ণ কোথায় ?

—অ্যাঁ? পিসেমশাই বললেন।

—পালিয়েছে, বললেন মামা।

বিজয়লালবাবু হাসেন—এইটাই হল বোঝার ওপর শাকের আঁটি। লোকটা চালাক হয়েও বোকা, ভেবেছে পালিয়ে রেহাই পাবে। ওর এই পালানোটাই ওর ওপর শেষ প্রমাণ। তবে, বাছাধনকে যেতে হবে না বেশীদূর। নিচে আমার লোক এমনি সাধারণ পোষাকে খাড়া আছে, যতক্ষণ আমি ওপরে থাকব ততক্ষণ কেউ পালাতে পারবে না।

তারপরে? আরও শুনতে চাও? দেওনারায়ণ ধরা পড়ল, বামাল পাওয়া গেল তার কাছে। শুধু মামারটা নয়, আরও অনেকের। লোকটা বেহারী মোটেই নয়, একটা পাকা বাঙালী চোর। নানা জায়গায় নানারকম সেজে চুরি করেছে। সিন্ধুক ভাঙায় লোকটা একেবারে পাকা। তারপরে তার দুঃখের কাহিনী আর নাই বা শুনলে।

এ সবের পর অনেকদিন কেটে গেছে। সে-সব দিনগুলো আজকাল এক-একবার স্বপ্নের মত মনে ভেসে আসে আবার স্বপ্নের মতই মিলিয়ে যায়। স্মৃতির ওপর কিন্তু তাদের দাগ থেকে যায়। তাই স্মৃতির পাতা থেকে এক-একটা কাহিনী তোমাদের উপহার দিই। কী অদ্ভুত আমাদের ওই চলে যাওয়া দিনগুলো!

ঈগল! ঈগল!

ধাপে ধাপে পাহাড় যেখানে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে, পাহাড়ের গায়ে গাছের লাইন শেষ হয়ে গেছে যেখানে, তারও ওপরে শূন্যে বেরিয়ে আসা একটা পাথরের চাঁই-এর ওপর ডালপাতা দিয়ে বাসা বেঁধেছে স্বর্ণ-ঈগল। সেখান থেকে দীর্ঘ সোজা দেওদার আর রডোড্রেণ্ড্রনের বনগুলোকে যেন মনে হয় ছোট ছোট ধানক্ষেতের সার। অত উঁচুতে থাকে বলেই নিচের বনের জানোয়ারেরা আকাশে ঈগল ভাসলেও দেখতে পায় না। কিন্তু অদ্ভুত ঈগলের চোখ! সেই উঁচু মহাশূন্য থেকেও নিচে, অনেক নিচে বনে ঘাসের ভেতর একটা ইঁদুর নড়লেও তার নজর এড়ায় না। ঈগলের চোখ যেন দূরবীন।

পাহাড়ের ওপর সেই বাসায় সেবার দুটো বাচ্ছা হয়েছে ঈগলের। বাচ্ছা দুটো বাসা থেকে আকাশে ন্যাড়া মাথা বার করে চিঁ চিঁ করে ডাকে। থেকে-থেকে আকাশ ঘন মেঘের কুয়াশায় ঢেকে যায়। সেই মেঘের সমুদ্দুর ভেদ করে শিকার ঝুলিয়ে নিয়ে কখন তাদের মা দেখা দেবে? বাচ্ছা দুটো হাঁ-হাঁ করতে থাকে।

ওদিকে ঈগল ভেসে পড়েছে আকাশে। ঈগলের ওড়ার একটা বিশেষত্ব আছে। অন্য পাখিদের মত সে ডানা ঝাপটে ওড়ে না, বাতাসে পাখা ছড়িয়ে দিয়ে ভেসে চলে। পার হয়ে যায় পাহাড়ের পর পাহাড়। নিচে সবুজ বন সোনালি রোদ মেখে ঝল্‌মল্‌ করে। কোথাও একটা পাহাড়ি ঝরণার জলে রূপোলি মুক্তোর কণা ছিট্‌কে ছিট্‌কে ওঠে। কোথায় শিকার? ঈগল লেজের পাখা ঘুরিয়ে দিক বদলায়। শিকার কোথায় আজ? বাচ্ছারা তার তখনও না-খেয়ে আছে।

আকাশের রাজা স্বর্ণ-ঈগলকে ভয় করে না, ময়ূরকণ্ঠী বনে এমন জানোয়ার কম। তেরঙা তিতিরেরা থেকে-থেকে বুনো কাশ-ঝোপে লুকিয়ে পড়ে। মর্কট বানরগুলোর কাণ্ড দেখলে হাসি পায়। তারা গাছের ডগায় বসে বুনো কচি ফল খেতে খেতে অনবরত আকাশে তাকায় আর কিচিকিচি করে ডেকে ওঠে। ঐ বুঝি দুরন্ত ঈগল বিদ্যুতের মত ঠিকরে এসে তাদের একজনকে তুলে নিয়ে গেল। কখন যে নামে ঈগলটা তারা টেরও পায় না। এই দেখ আকাশের শূন্য নীলিমায় বরফান পাহাড়ের গম্ভীর চূড়োগুলো ছাড়া কিছু নেই, পরমুহূর্তে চোখ ধাঁধিয়ে ছোঁ মারে স্বর্ণ-ঈগল! আইবেক্সের বাচ্ছা, খরগোসের পাল, ময়ূরকণ্ঠী বনের সব জানোয়ারই সামলে চলে ঈগলকে।

কয়েকটা বোকা তিতিরের বৌ আপন মনে বনের ভেতর পোকা খেতে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু তিতির-সর্দার হঠাৎ ভুতুড়ে ডাক ডেকে উঠে বোকা বৌদের সাবধান করে দেয়। নাঃ, ঈগলের আজ শিকার জোটা ভার। শিকার খুঁজতে খুঁজতে বাতাসে সোঁ সোঁ ভেসে চলে।

সে বনের পাশেই পাহাড়ের মাঝখানে থাকত লালসিং। একটু-খানি তার মকাই ক্ষেত। কয়েকটা ছাগল তার মোটও বয়, দুধও দেয়। পাখি ধরা তার ব্যবসা। পাহাড়ি বড় পাখি ধরার এক-রকম টানা জাল সে পেতে রাখত। খুব জোরে উড়তে উড়তে শিক্‌রে বা অন্য দু-এক রকম পাখি সেই জালে আটকে ঝুপ করে জড়িয়ে পড়ত। শিক্‌রে পাখিগুলো রাজামহারাজার কাছে চড়া দামে বিকোত।

লাল সিংএর ডেরার ওপর বসে ঈগল দেখতে পেল ছানাপোনা-শুদ্ধ কয়েকটা ছাগল চরছে। দুটো ছাগলছানা তখন তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে। আর হঠাৎ ডানা গুটিয়ে ফেলে তীরের মত নেমে এল ঈগল। একটা চিৎকার। ছাগল-ছানাটার মা করুণভাবে চেঁচাতে

চেঁচাতে ছুটোছুটি করছে। গাদা বন্দুক হাতে ধেয়ে এল লালসিং, কিন্তু ঈগল তখন বাতাসের স্তর ভেদ করে করে সজোর পাখায় শূন্যে —মহাশূন্যে উঠে যাচ্ছে। আর তার নখে ঝুলে আছে মরা একটা ছাগলছানা।

*   *   *   *

এদিকে হয়েছে কী,—মায়ের দেরি দেখে ক্ষিদের জ্বালায় ঈগলের বাচ্ছা দুটো চঞ্চল হয়ে নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ঠেলাঠেলি করতে করতে তারা ক্রমশ পাহাড়ের ধারে এগিয়ে আসে, আর ধারের দিকের বাচ্ছাটা হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে ঝুপ্ করে অতল খাদে পড়ে যায়। ঈগলের বাচ্ছা দুটো তখনও উড়তে শেখেনি। সেই পাহাড়ের নিচের বনে থাকত একটা বনবেরাল। ঈগলের বাচ্ছাটা নিচে পড়বামাত্র বনবেরালটা মহা আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপরে। ঠিক সেই সময় মেঘের স্তর ভেদ করে এসে ঈগল তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে—কী কী কীরকী কি !

সেই থেকে ঈগল আর বনবেরালে চির শত্রুতা।

*   *   *   *

সবুজ সরস কচি ঘাসের ডগাগুলো কুটকুট করে খাচ্ছিল একটা পাঁশুটে খরগোস। সে জানতেও পারেনি যে তিল তিল করে মরণ এগিয়ে আসছে তার দিকে। বনবেরালটা তার মখমল-মোড়া পায়ে নিঃশব্দে ওৎ পেতে বসল খরগোসটা লক্ষ্য করে। আর এক মুহূর্তে শিকার চলে আসবে থাবার নিচে। হঠাৎ—হু-উ-স ! প্রায় বন-বেরালের মুখের ওপর থেকে ছোঁ মেরে খরগোসটাকে তুলে নিয়ে গেল ঈগল। মহা রাগে ফ্যাঁস করে লাফিয়ে উঠল বনবেরাল। কিন্তু ঈগল ততক্ষণে নাগালের বাইরে।

এমনি করে ঈগল প্রতিনিয়তই বনবেরালের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যেতে লাগল আর রাগে জ্বলে মরতে লাগল বনবেরালটা।

শীত এসে গেল। বরফে সাদা হয়ে গেল বনভূমি। সরল ফার গাছগুলো বরফে ঢেকে শীতের জয়স্তম্ভ তুলে দিল আকাশে। সমস্ত বনের একটা রিক্ত বৈরাগী মূর্তি। জানোয়ারেরা আশ্রয় নিয়েছে যে-যার কোটরে। কেউ বা নেমে গেল নিচে—আরও নিচের বনে। ওপরের বনে এখন শিকার জোটা ভার।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বরফান পাহাড়ের মাথায় মাথায় অস্তসূর্য যখন সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে, ঈগল চলেছিল নিচে দিয়ে, যদি একটা শিকার জোটে—হঠাৎ একটা কিসের সঙ্গে খেল ধাক্কা। সঙ্গে-সঙ্গে একটা জালে জড়িয়ে ঝুপ করে পড়ে গেল ঈগল। ধীরে ধীরে পাহাড়ি অন্ধকার নেমে আসতে লাগল পৃথিবীর বুকে।

আকাশের রাজা ঈগল জালে বন্দী থাকবার পাত্র নয়। তীক্ষ্ণ ঠোঁট আর নখ দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে সে যখন জালের মোটা সুতোগুলো ছিঁড়ে ফেলছে, হঠাৎ দূরে অন্ধকারে একজোড়া নীল চোখ ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে উঠল। দুই শত্রু আজ মুখোমুখি। বনবেরালটাও শিকারের অভাবে লালসিং-এর ডেরার দিকে এসেছিল এক-আধটা ছাগলছানা বা মুরগির লোভে। হঠাৎ এ কী বিস্ময়! চিরশত্রু ঈগলটা সামনে জালে বন্দী? এমন সুযোগ জীবনে আর আসে? ফ্যাঁশ করে অস্ফুট একটা গর্জন করে বনবেরাল লাফিয়ে পড়ল ঈগলের ঘাড়ে।

বেচারি ঈগলের ডানাদুটো তখনও জালে জড়ানো, কিন্তু মুখটা তার বেরিয়ে এসেছে। বনবেরালের থাবায় পিঠ তার ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, তবু সে কোনমতে জালে বদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে উঠে বিদ্যুতের মত মাথা ঘুরিয়ে বনবেরালের মাথায় মারল এক প্রচণ্ড ঠোকর! ব্যস্! ইস্পাতের তীক্ষ্ণ ফলার মত তার ঠোঁটের এক ঘায়েই ফেটে গেল বনবেরালের মাথা। গরম রক্ত চুইয়ে গড়িয়ে এল সেখান দিয়ে। তীক্ষ্ণ চীৎকার করে কাঁপতে কাঁপতে গড়িয়ে পড়ে গেল বনবেরাল।

আর ঝটপট ঝটপট করে ছেঁড়া জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল ঈগল।

কি-ই-কী—কীরকী কীই—ঈগলের ডাকে জয়ের ঘোষণা—মুক্তির আনন্দ।

টলতে টলতে বাতাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, আর ঘনায়মান অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে দূর পাহাড়ের জ্বলন্ত চূড়া লক্ষ্য করে সে উঠে যেতে লাগল।

আক্রমণ

পৃথিবী তখন আদিম। আকাশে-আকাশে সিন্ধুর কল্লোল-মাখা আশিস্ থরে-থরে মেঘ হয়ে ভেসে আছে। আর চাষা এদিকের পৃথিবীকে ঘিরে-ঘিরে যেন দিগন্তে আল্‌পনা দিয়েছে। ফসলের হাসিমাখা মুখে লেগে আছে রোদের নরম চুমু।

মানুষ তখন ব্যাধবৃত্তি ছেড়ে সবে পৃথিবীর বুকে ফসল ফলাতে শুরু করেছে। বৈজ্ঞানিক মানুষ আবিষ্কার করে ফেলেছিল আগুন, তারপরে আবিষ্কার করেছে—চাকা। তার বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানের গর্বে মানুষ তখন গর্বিত। সেইসময় তারা আক্রমণ করল।

একটা ক্ষুদে জীব, সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামী স্কাউট। শরীরের ভেতর মাথাটাই তার আধখানা। মাথার ওপর বেরিয়ে-আসা ছুটো বড়-বড় চোখ। আর মাথা থেকে বেরিয়ে এসেছে ছুটো রেডিওর এরিয়েল। 'রাডার' বা শব্দভেদী যন্ত্রটা মানুষ অনেক—অনেক পরে আবিষ্কার করেছে, কিন্তু ওই ক্ষুদে জীবটার শরীরেই লাগানো ছিল রাডার-যন্ত্র। সেই রাডার-যন্ত্রের বীম ফেলতে-ফেলতে স্কাউটটা এগিয়ে চলেছে নিঃশব্দে। রাডার-যন্ত্রের তারে বারবার চম্‌কে যাচ্ছে—খাবার, খাবার, অনেক খাবার···

স্কাউটটা চোখে দেখে চলছিল না, চলছিল যন্ত্রের সাহায্যে। তাই অদ্ভুত তার চলা, যেন দিক্-ভুল হয়েছে তার। একবার এদিক, একবার ওদিক,—একবার এগিয়ে, একবার পেছিয়ে। রাডার-যন্ত্রের তারে বারবার—খাবার, খাবার, খাবার !

সামনে পাহাড়-প্রমাণ দেয়াল—কিন্তু দেয়ালের ওপার থেকেই যে বীমের পর বীম—খাবার আর খাবার! স্কাউটটা দেয়ালের নিচে দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটতে লেগে গেল। আর হঠাৎ—চিচিং ফাঁক! স্তূপের পর স্তূপ শুধু খাবার! স্কাউটটা দুপেয়ে মানুষদের ফসলের জমানো মরাই আবিষ্কার করেছিল।

দুপেয়ে মানুষেরা তখনও শহর গড়তে শেখেনি। কিন্তু ওই বৈজ্ঞানিক জীবদের আটঘাট বাঁধা, আকাশ-ছোঁয়া আজব শহর। আকাশ-ছোঁয়া অবশ্য দুপেয়ে মানুষদের হিসেবে নয়, ওদের তুলনায়। সে শহরের যেমন প্ল্যান, তেমনি তা বিজ্ঞানের সাহায্যে গড়া—আধো পাতালে নেমে গেছে। সে শহরের সিং-দরজা অদ্ভুত কায়দায় তৈরি। বন্যা এলেও তার ভেতর দিয়ে জল যায় না, বাতাসের চাপে দরজার মুখ আপনি বন্ধ হয়ে যায়। অদ্ভুত শৃঙ্খলা-বাঁধা জাত ওরা। শহরটা থাকে-থাকে কিছু ওপরে আকাশে উঠে গেছে—কিছু গেছে নিচে নেমে থাকে থাকে। সিং-দরজা পার হয়েই প্রথমে আক্রমণকারী সৈন্যদের ঘাঁটি, তার ওপরে আর নিচে থাকে কর্মী সৈন্যের দল, বা ইঞ্জিনীয়ারিং কোর। তারও নিচে শহরের কোষাগার, বা খাদ্য-ভাণ্ডার, আর সব নিচে ওদের রানীর প্রাসাদ। ওরা রাজা বরদাস্ত করে না, রানীই ওদের বাঁধন—রানীই জাতের মূল।

ওদের শহরে সেদিন মহা ধুমধাম—রানীর বিয়ে।

দুপেয়ে মানুষেরা এরোপ্লেন আবিষ্কার করেছে তো মাত্র সেদিন। ওরা উড়তে ভালোবাসে না, কিন্তু ইচ্ছেমত নিজেদের শরীরেই পাখা গজিয়ে খুশিমত ওরা উড়ে যেতে পারে। উড়তে ভালো না বাসলেও, রানীর বিয়ের দিন ওদের ওড়ার প্রতিযোগিতা হয়। রানীই সবচেয়ে এস্ পাইলট, বা পাকা-উড়িয়ে। এই রানীর বিয়ের দিন যে উড়ে রানীকে ধরতে পারে, তারই সঙ্গে হয় রানীর বিয়ে।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ওরা কথা বলার বালাই তুলে দিয়েছে। যখন দুপেয়ে মানুষেরা তখনও প্রায় বন্য, বিজ্ঞানের উন্নতি যখন তাদের মাত্র আগুনে আর চাকায়, বর্শার ফলায় আর লাঙলে,—ওরা তখন ওড়ে, বেতারে-বেতারে ভাবের আদান-প্রদান করে, শব্দভেদী যন্ত্র দিয়ে ওদের প্রয়োজন খুঁজে মিটিয়ে নেয়।

ওরা অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক, শৃঙ্খলা-বাঁধা ঝক্‌মকে সৈন্যবাহিনী।

রানীর বিয়ের উৎসবের আয়োজনে পাকা-উড়িয়েরা যখন শরীরে পাখা গজিয়ে তৈরি হচ্ছে, সেইসময় হঠাৎ কর্মী-সৈন্যদের শরীরের এরিয়েল তারে-তারে ঝঙ্কার এসে গেল—খাবার! খাবার! কর্মী-সৈন্যদের সেনাপতি পিংএর নিঃশব্দ আদেশ ছড়িয়ে গেল—ফরোয়ার্ড মার্চ!

একটা দল সার বেঁধে সিং-দরজা দিয়ে হু-হু করে বেরিয়ে ছুটে চলল, যেদিক থেকে তাদের স্কাউটের রেডিও-ঘোষণা ভেসে আসছিল—খাবার! খাবার!

ওরা দুপেয়ে মানুষদের শারীরিক আক্রমণ করেনি। আক্রমণ করল তাদের খাদ্য-ভাণ্ডার, নিঃশব্দে, গেরিলা-কায়দায়।

ফুলে ফুলে মধু-র ভাণ্ডার। ফুল সুরভি ছড়িয়ে আবাহন করে মৌমাছিদের। মৌমাছিরা ফুলের ভেতর থেকে সভয়ে লক্ষ্য করল এই বৈজ্ঞানিক-বাহিনীর অভিযান। তারপর আজ ওদের শহরে ব্যাপার কী? সিং-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং রানী। সোনালি-লাল তাঁর বরণ, গায়ে ঝক্‌মকে কাঁচের মত স্বচ্ছ পাখা আঁটা। রানী সর্বসাধারণের চেয়ে আকারে বেশ বড়। একটা পাক ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রানী শূন্যে, আর তীরবেগে জেট-এরোপ্লেনের মত আকাশে উঠে যেতে লাগলেন। দেখতে-দেখতে শহরের সিং-দরজা

দিয়ে একের পর এক সার বেঁধে পাকা-উড়িয়ে আকাশে উঠে যেতে লাগল—কে ধরতে পারে রানীকে?

পাইলটের দল পেছিয়ে পড়তে লাগল। শুধু একজন পাকা-উড়িয়ে, সে-ই অন্য সকলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। সে যেন মরীয়া…ধরবেই সে রানীকে। রানী গতি বাড়িয়ে দিলেন। ছাড়িয়ে বটের মাথা, ছাড়িয়ে দেবদারুর চূড়া, শূন্যে, মহাশূন্যে, সোনালি-রোদ-মাখা মহাকাশে। আর সেই এগিয়ে-আসা পাইলট, সেও তার জেট-ইঞ্জিন যেন সব কটা খুলে দিয়েছে। বুক তার ফেটে যাবার জোগাড়, কিন্তু রানীর আর তার মধ্যে দূরত্ব কমে আসছে। একটু…একটু…আর-একটু। ক্ষুদে-জীবটার বাতাসের নলী বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু সে ধরে ফেলেছে রানীকে। পাখা দিয়ে এক ঝাপ্‌টা!

রানীর সঙ্গে সেই পাকা-পাইলটের বিয়ে হয়ে গেল—সেই মহাকাশে, সোনালি-রোদ-মাখা মহাশূন্যে। কিন্তু বেচারি বর! রানীর গতির সঙ্গে গতি রাখতে গিয়ে তার এরোপ্লেন-শরীরের বাতাস-রাখা ফুসফুস ফেটে গেল! হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে প্রাণহীন দেহটা তার পড়তে লাগল।

রানীর ভ্রূক্ষেপ নেই। বিয়ে হয়ে গেছে। রানী নেমে এসে, পাখা ফেলে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। তাঁর এখন অনেক কাজ! সৈন্য সৃষ্টি করতে হবে। আক্রমণকারী-সৈন্য, কর্মী-সৈন্য, আরও অনেক নাগরিক।

সেদিন সকালে হুপেয়েদের গিন্নি ফসলের মরাইএ এসে দেখেন—সে কী কাণ্ড! মরাই লুঠ! চোখের সামনে দিয়ে বেপরোয়া একদল অদ্ভুত সৈন্য খাবারের মরাই লুঠে নিয়ে চলে যাচ্ছে! হুপেয়েদের গিন্নি কোমর বাঁধলেন। নিয়ে এলেন তাঁর অস্ত্র—ঝাঁটাখানা। চলতে লাগল সপাসপ অস্ত্রের আঘাত আর

কাৎ হয়ে পড়তে লাগল সেই বৈজ্ঞানিক-সৈন্যদল। সপাসপ—সুইং!

কর্মী-সেনাপতি পিং চট করে একটা টিলার ওপর উঠে বেতারে এস্-ও-এস্ ছাড়তে লাগলেন।

এদের শহরে আক্রমণকারী-সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি মিং লাফিয়ে উঠলেন।

নিঃশব্দ বেতারে-বেতারে আদেশ ছড়িয়ে গেল—ফরোয়ার্ড মার্চ! চার্জ!

দলে-দলে আক্রমণকারী-সৈন্যেরা তিন সারে ছুটে চলল, আর মরাইএর কাছে গিয়ে তিনটে সার বিভক্ত হয়ে গিয়ে ঘিরে ফেলল শত্রুকে।

তখনও সমানে চলেছে লড়াই—সপাং সপাং সুইং!

চার্জ বেয়নেট!

আর অকস্মাৎ তুপেয়েদের গিন্নির পদদেশে একসঙ্গে হাজারটা বেয়নেটের তীক্ষ্ণ ঘা। গিন্নি লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু মানুষের গিন্নিরা লড়িয়ে জাত, সহজে হারবার পাত্রী নয়। গিন্নি লাফান আর তাঁর মহাস্ত্র চলে—সপাং, সপাং, সুইং!

মিংএর নিঃশব্দ বেতার-আদেশ ছড়িয়ে গেল ওপর থেকে—চার্জ কর!

একদল সৈন্য তুপেয়ে-গিন্নির পা বেয়ে উঠে যেতে লাগল।

গিন্নিদের কাবু করবার একরকম অস্ত্র—লাফিং গ্যাস। শুড়শুড়ির প্রথম চোটেই গিন্নি খানিকটা ঘায়েল, তারপর যখন সৈন্যেরা একজোটে হাতে-পায়ে-মাথায় বেয়নেট চার্জ শুরু করল, ফসলের তুর্গ আর রাখা গেল না। তুপেয়েদের গিন্নি রণে ভঙ্গ দিলেন।

আর অদ্ভুত ওই আক্রমণকারী জাত। যুদ্ধ যখন প্রচণ্ডবেগে চলছিল, কর্মী-সৈন্যদল নিঃশব্দে ফসলের ভাণ্ডার উজাড় করতে লেগে গিয়েছিল।

দুপেয়েদের গিন্নি কিন্তু ওখানেই ক্ষান্ত হন্‌নি। এইবারে তিনি ধেয়ে এলেন দুটো কুকুর নিয়ে! রোখা বাঘা কুকুর। কুকুর দুটো সবেগে আক্রমণ করল।

মিংএর হুকুম ছড়িয়ে গেল। আর ওরা যেন হঠাৎ একসঙ্গে দল পাকিয়ে একজোট হয়ে গেল। আর কুকুর দুটো যেই তেড়ে এসে পড়েছে, পিল-পিল করে ছড়িয়ে গেল তারা কুকুর দুটোর গায়ে···মুখে···মাথায়। সঙ্গে-সঙ্গে সহস্র বেয়নেট চার্জ। মুহূর্তের মধ্যে কুকুর দুটো লেজগুলো পেটে ঢুকিয়ে কেঁউ-কেঁউ করতে-করতে হাওয়া···

নাঃ, এরপর আর চলে না। ডাক পড়ল কর্তাদের। তাঁরা এসে কেউ দাড়ি চোমরালেন, কেউ গোঁফে তা দিলেন, আর বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি এসে যেতে দেরি লাগল না।

—ফসলের মরাইএর চারদিকে খাল কেটে দেওয়া হোক্। আগুয়ান, বা পেছুয়ান হওয়ার পথ বন্ধ করতে হবে।

যেমন কথা। মরাইকে ঘিরে খাল কেটে ফেলা হল। জলে ভর্তি। দাড়ি চুমরে গোঁফে তা দিয়ে কর্তারা গেলেন লেগে কাজে, আর গিন্নিরা ঝেঁটিয়ে দিলেন অবশিষ্ট কজনকে।

জেনারেল মিং নিঃশব্দে পিংকে বললেন—পিং, এবার তোমার এলাকা।

জেনারেল পিংও এরিয়েলে জবাব দিলেন,—বহুত আচ্ছা। কিন্তু তোমার সৈন্যরা যেন আমার সৈন্যদের আগলে রাখে।

হুকুম ছড়িয়ে গেল।

আর এবারে দেখতে-দেখতে এগিয়ে এল সুইসাইড স্কোয়াড,

বা আত্মঘাতী সৈন্যের দল। সার বেঁধে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। আর এ-পার থেকে ও-পারে পোল হয়ে ভেসে রইল। কর্মী-সৈন্যের দল তাদের ওপর দিয়ে যেমন-কে-তেমন মাল চালান করতে রইল।

ওদিকে আর-একদল কর্মী-সৈন্যকে আগ্‌লে নিয়ে একটা বাহিনী ছুটে চলল ত্বপেয়েদের বাড়ির পানে। গিন্নির কাপড়ে-আঁটা কয়েকটা স্কাউটের বেতার সংবাদ ভেসে আসছিল—"খাবার—খাবার—এখানেও খাবার!"

বৈজ্ঞানিক মানুষ দেখল, তাদের মরাই আক্রমণ তো বন্ধ হয়ই-নি, বরং এবার তাদের ঘরেও চড়াও হয়েছে তারা। বৈজ্ঞানিক মানুষ গেল ক্ষেপে। ক্ষুদে জীব, কিন্তু সংখ্যায় যে অসংখ্য! কিন্তু মানুষের হাতে আগুন আছে।....লাগাও আগুন!

মরল অসংখ্য ওরা আগুনে ঝল্‌সে, কিন্তু রানী তাদের সৃষ্টি করে চলেছেন। ওদিকে আবার মরাইতেও লাগল আগুন! ঘরে আগুন লাগতেই শুধু বাকি রইল। ক্ষেপে গেল মানুষ। কোদাল আর লাঙল নিয়ে ছুটল তারা। কোথা থেকে আসে ওরা? কোথায় ওদের শহর? দেখতে-দেখতে ওদের শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল!

একটা দল কিন্তু সরে গিয়েছিল রানীকে নিয়ে। না নিলেই-বা কী হত? রানী ইতিমধ্যে আরও একজন রানী সৃষ্টি করে রেখেছিলেন।

ওরা চলে এল সোজা ত্বপেয়েদের ঘরের নিচে। রাতারাতি সুড়ঙ্গ কেটে ঘরের নিচে শহর বানিয়ে ফেলল ওরা। সকালে উঠে ত্বপেয়ে মানুষ দেখে, বেশ বেপরোয়া ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে—মেঝেয়, দাওয়ায়, টেবিলে, রান্নাঘরে। আবার শুরু হল লড়াই।

বৈজ্ঞানিক মানুষ কয়েকজন কিন্তু লক্ষ্য করতে লাগল ওদের।

কী করে, কেমন করে, কোথা থেকে আসে? আর তারাই বলল যে,—শিখতে হবে মানুষকে ওদের কাছে—শৃঙ্খলা, চেষ্টা আর অদম্যতা। ওদের মেনেও নিতে হবে, আবার হঠিয়েও দিতে হবে।

তাই সে লড়াই আজও শেষ হয়নি। মানুষ মেনে নিয়েছে ওই অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা-বাঁধা ঝক্‌মকে জাতকে, আবার লড়াইও ক্ষান্ত হয়নি। আজ বলা যায় না, কে হেরেছে বা জিতেছে!

অদ্ভুত ওই বৈজ্ঞানিক জাত হলো—পিঁপড়ে।

শত্রুর শেষ নেই

মা একদিন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় বাচ্চু প্রথমটায় নিজেকে বড় নিঃসহায় মনে করেছিল। কিন্তু জানোয়ারের জীবনে বেশীদিন নির্ভরশীল হয়ে থাকা চলে না। খানিকক্ষণ অনুচ্চ একটা আর্তনাদ করে মাকে ডেকে না পেয়ে, সে, সর্দার যেখানে বসে সবুজ ঘাসের ডগাগুলো কুট্-কুট্ করে খাচ্ছিল—তার গায়ে প্রায় চেপে ঘেঁসে বসে অল্প-অল্প কাঁপতে লাগল। সর্দারের দীর্ঘ কানদুটো একবার নড়ে উঠল, লাল চঞ্চল চোখ দুটো ঘুরে গেল একবার বাচ্চুর ওপর দিয়ে, তারপর আবার সে একমনে কচি ঘাসের ডগাগুলো খেয়ে যেতে লাগল। সে বুঝতে পেরেছে ওই বাচ্চাটার অভাব কিসের। কিন্তু ওকে নিজেকেই সামলে নিতে হবে, শিক্ষা করতে হবে আত্মরক্ষার উপায়। খরগোসদের শত্রুর শেষ নেই!

শীতের শেষ। চৈতালি ফুলে-ফুলে ভরে ওঠে বন, আর শীতের দীর্ঘ ঘুম ভেঙে ভাল্লুকেরা নেমে আসে মধু আর শিকারের লোভে-লোভে। ময়ূরপঙ্খীর সার ভাসিয়ে বাদায় নামে যাযাবর বিগড়ি-হাঁসের সার। তে-রঙা তিতিরের ডাকে খড়কাইএর বন সচকিত হয়ে ওঠে। শীতে শীর্ণ বনবেরালটার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। ঈগলের দূর-বীক্ষণ চোখ দুটো হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণতর। সেই সময় আসলো বন থেকে নখদন্তহীন খরগোসদের সরে যাবার সময়। সেই সময় তারা সরে যায় অপেক্ষাকৃত নির্জন বালুময় অঞ্চলে। বালির ঢিবির ভেতর তারা কুরে-কুরে ঘর করে। আসল বনে তখন অসংখ্য শত্রু!

সেই শত্রুভীতিপূর্ণ অঞ্চল ছেড়ে দলটাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে খরগোস-সর্দার। এই সেদিনও তার দলের কয়েকটা খরগোস

বুনো শেয়ালের পেটে গেল। আর ক্ষুধিত বনবেরালটাও সাক্ষাৎ রাক্ষস! খাওয়া শেষ করে, সর্দার একটা অনুচ্চ শব্দ করে ধীর পায়ে নিঃশব্দে চলতে শুরু করল। কাণ দুটো তাদের খাড়া, চোখ-দুটো শত্রুর উপস্থিতি অনুভব করে-করে ক্ষিপ্র ও ঘুরন্ত। আর পেছনে তার লম্বা-লম্বা ঘাসের ভেতর সর্দারকে অনুসরণ করে অসংখ্য খরগোসের পাল! ওপর থেকে সামান্য একটু দেখা যায়, লম্বা-লম্বা ঘাসগুলো দুলছে। বাচ্চু ঠিক সর্দারের পেছু নিয়েছে।

বনের ভেতর শিকারের গতিবিধি সম্বন্ধে বনবেরালটারও অভিজ্ঞতা কম নয়! অনেক দূর থেকেই ঘাসের ভেতর সর্‌সর্‌ শব্দ তার কানে এসেছে। কোনো জানোয়ার যে চলেছে ঘাসের ভেতর দিয়ে, অনুভব করল সে।

কিসের শব্দ? সেই ভয়ঙ্কর কালো বাঘটা ত নয়? কালো বাঘটাকে বনবেরাল পছন্দ করে না। মার্জার-জাতীয় পশুরাই অন্য শ্রেণীর বেড়ালদের পছন্দ করে না। কিন্তু না, কালো বাঘ হতে পারে না। ওখানে অনেকগুলো শব্দ—একটা দল! ইঁদুর নয় তো? বনবেরাল মখমল-আঁটা পায়ে এগিয়ে চলে। শিকার আর শিকারী মুখোমুখি এগোতে থাকে।

মাথার ওপর কয়েকটা লঙ্গুর-বানরের কিচ্‌-কিচ্‌ শব্দ। হঠাৎ খরগোস-সর্দার থেমে যেন জমে গেল! আর কোথাও একটুও স্পন্দন নেই! সর্দারের সঙ্গে খরগোসের দলও নিথর! সামনে শত্রুর উপস্থিতি অনুভব করেছে তারা। কিন্তু বাচ্চু অত-শত জানে না, সে লাফাতে-লাফাতে এগিয়ে চলল।

এই বনময় পৃথিবীটা কী অদ্ভুত, কী আশ্চর্য! হঠাৎ সে অনুভব করল, সে একা; তার আশে-পাশে কেউ নেই। আর অল্প দূরেই ঘাসের ভেতর আবছা অন্ধকারে একজোড়া যেন নীল আগুন!

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল বাচ্চু। ফ্যাস্‌ করে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন কানে এল তার। পর-মুহূর্তেই দিগ্বিদিক-জ্ঞান হারিয়ে সে ছুটল

একদিকে। জন্মগত অনুভূতি তাকে বলে দিয়েছে যে—সামনে বিপদ!

শিকার পালায়! ঘাসের ভেতর পাঁশুটে শরীরটা মিশিয়ে দিয়ে বনবেরাল স্থির হয়ে দেখছিল, একটা খরগোসের বাচ্ছা কেমন লাফাতে-লাফাতে এগিয়ে আসছে তার মুখের ভেতর! সে এতটুকু নড়েনি। অনেক সময় শিকারী-চেষ্টার চেয়ে শিকারী-বুদ্ধি কাজ করে বেশী। কিন্তু খরগোস-বাচ্ছাটা টের পেয়ে গেছে হঠাৎ। শিকার পালায়! ক্রুদ্ধ গর্জন ছেড়ে তিন লাফে বনবেরাল শিকারের পেছু নিল।

নখ-দন্তহীন খরগোসদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়, গতি। বাচ্চু তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে।

শীর্ণ বনবেরালটার পেশীতেও যথেষ্ট সাবলীলতা। মুখের গ্রাস ফসকে যাবে? বন ক্রমশ অপেক্ষাকৃত ফাঁকা হয়ে আসছে। সামনে বাদা, ভেসে আসছে বিগড়ি-হাঁসেদের কলরব। দম ফুরিয়ে এল। ওই ভয়ঙ্কর শত্রুটার চোখে কি ধূলো দেওয়া যাবে? হঠাৎ খরগোস-বাচ্ছাটা অনুভব করল, সামনেই যেন মাথার ওপর একটা ভয়ঙ্কর শোঁ-শোঁ শব্দ! পেছনে ওই ক্ষুধিত বনবেরাল, আর সামনেই নামছে ঈগলের ভয়ঙ্কর ছোঁ। জন্ম-জন্মান্তের অনুভূতিতে তার ক্ষিপ্র গতি থামিয়ে একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল বাচ্চু। তার শরীরে গতি নেই, স্পন্দন নেই; রয়েছে প্রকৃতির দেওয়া অদ্ভুত একটা স্থিরতা।

ওদিকে নিজের গতিবেগ সামলাতে-সামলাতে একটা লাফ মেরেছে বনবেড়াল। সেই লাফ খরগোস-বাচ্ছাটার অকস্মাৎ থেমে যাওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট। ওদিকে ঈগলটারও শেষ ছোঁ সবেগে নেমে এসেছে। এই ঈগলটা বনবেরালের চিরশত্রু। কতবার বনবেড়ালের মুখের গ্রাস ঈগলটা ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেছে! আজ সাক্ষাৎ। বাচ্চুর প্রকৃতিদত্ত এক চালে ঈগলেরও লক্ষ্য ভ্রষ্ট। বনবেরালটার

শিকারী লাফ তখন ঠিক একেবারে ঈগলটার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়েছে।

একটা চীৎকার! ফ্যাঁস্—স্—স্! ঈগলটা পড়েছে তলায়। অন্ধের মত বনবেরাল থাবা চালাচ্ছে, ঈগলের প্রকাণ্ড ডানাদুটোর ভেতর তার দেহ আচ্ছন্ন। হাঁসেরা একটাও পাড়ে নেই। বাদার মাঝখানে ভয়ে ডানা আছড়াচ্ছে তারা। লঙ্গুরেরা গাছের ডালে মহা কলরব বাধিয়ে তুলেছে। হঠাৎ ঈগলের তীক্ষ্ণ চঞ্চুর এক ঘায়ে বনবেরালটা ছিটকে পড়ল। টলতে-টলতে ঈগলটা উঠে যাচ্ছে আকাশে, আর বনবেরাল ল্যাজ তুলে নেংচাতে-নেংচাতে চোরের মতো চলেছে বনের ভেতর। দুই শত্রু পরস্পরের শক্তির আস্বাদ পেয়েছে।

বাচ্চু ততক্ষণে আর সেখানে থাকে? বনের বড়-বড় ঘাস লক্ষ্য করে সে তখন উবে গেছে!

আকাশের মাথায় পিঙ্গল চাঁদ একফালি—পাণ্ডুর। অদ্ভুত ভুতুড়ে আওয়াজ ভেসে ওঠে থেকে-থেকে বনের ভেতরে। সে শব্দ কখনও তীক্ষ্ণ করুণ, কখনও রহস্যময় ভুতুড়ে। তিনটে দিন নিজেকে নিজে চালিয়ে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে বাচ্চুর। বনের শিক্ষা হল স্থির-মস্তিষ্ক, নির্ভয়তা। ভয়ে জ্ঞান হারালেই বিপদ আসে এগিয়ে। এ সব শিখেছে খরগোস-বাচ্ছাটা। ঘাসের একটা গর্তের ভেতর কাণ দুটো সজাগ রেখে সে চোখ বুজে স্থির! অকস্মাৎ কাছেই বন কাঁপিয়ে, রাতের স্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে বনময় হায়েনার দলের ভুতুড়ে অট্টহাসি! সে জানে এই হায়েনার দলের পেছনে আছে ভয়ঙ্কর কালো বাঘ, আর তার পেছনে বুনো শিয়াল।

নিঃশব্দে বাচ্চু বেরিয়ে পড়ে। একবার তার দ্রুত গতি, আবার কিছুক্ষণ জমে-যাওয়া স্পন্দনহীন স্থিরতা। একবার সে একটা বুনো শেয়ালকেও ফাঁকি দিয়েছে। শেয়ালটা তাড়া করেছিল তাকে; কিন্তু সে হঠাৎ ছোটার পথে থেমে, ঘাসের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে—

যেদিক থেকে শেয়ালটা তাড়া করে আসছিল—সেই দিকেই পালিয়ে বাঁচে। বনের ভেতর বুদ্ধি দিয়ে আত্মরক্ষায় সে এখন ওয়াকিবহাল।

রাতেই পালানো সহজ। দিনের আলোয় একটা খোপর বা গর্ত দেখে সে গা-ঢাকা দেয়, আর পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় পথ দেখে রাতে সে পথ চলে। এম্‌নি ভাবে তিন দিন, তিন রাত!

হু-উস্ করে মাথার ওপর কি যেন উড়ে যায়। বাচ্চু জমে গেছে ঘাসের ভিতর! প্রায় পাশ থেকেই একটা ইঁদুর শিকার করেছে রাতচরা প্যাঁচা। আবার খানিকটা ক্ষিপ্র গতি। আবার থেমে, পথকে অনুভব করে নেয়। হঠাৎ এবার সে যেন কি একটা অদৃশ্য স্পন্দন অনুভব করল আশে-পাশে! কাণদুটো তার তখন সটান হয়ে উঠেছে। স্থির হয়ে একটু থেমে থেমে, সাবধানে সে এদিক-ওদিক তাকাল।

অনেকগুলো সাবধানী কাণ নড়ছে যেন তার আশে-পাশে! তারই আওয়াজে গা-ঢাকা-দেওয়া খরগোসের দল হঠাৎ আবার বেরিয়ে পথ চলতে শুরু করেছে। সে এসে পড়েছে তার দলের ভেতর। একটা অনুচ্চ আনন্দধ্বনি করতে-করতে সে এক ছুটে সর্দারের পাশাপাশি এসে দাঁড়াল। দলটা তখন গিয়ে চলেছে নিরাপত্তার সন্ধানে—তাদের বসন্তের কোটরে।

—

রূপোলি ইলিশ

সমুদ্দুরের মোহানায় কালাপানির কালো জলে গঙ্গা যেখানে শতমুখী হয়ে সাগরে মিশেছে, সেইখানে চিকিমিকি ঢেউয়ের তলে-তলে চরে বেড়ায় রূপোলি ইলিশের ঝাঁক। মাথায় আকাশ রুক্ষ নীল, সমুদ্দুর স্থির, মেঘ নেই—এতটুকু মেঘ নেই কোথাও। ঢেউয়ের মাথায় উঠে এসে গোদা-ইলিশ দেখে গেল বার-কয়েক। মেঘেরা গেল কোথায়? সেই ঘন কালো কাজল-কালো মেঘ, ঈশান-কোণে বাচ্ছা তিমির মত হয়ে দেখা দেয়, আর দেখতে দেখতে ঈশান-কোণের ঝড়ের ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সাঁ-সাঁ করে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলে, বৃষ্টির পরদায় ছেয়ে যায় দিক-দিগন্ত, সূর্যি-ঠাকুরের মুখ মলিন হয়ে যায় আর ফুলে ওঠে সমুদ্দুরের ঢেউ....সে কী আথাল-পাথাল!...

সেই হোলো ইলিশের ইশারা। যুগযুগান্তরের রহস্যময় টানে তারা সেইসময় ঢোকে লোনা-জল ছেড়ে নদীর ভেতরে। যেখানে অনাদিকাল হতে তারা জন্মায়—সেই, সেই তাদের জন্মস্থান। সেইখানে তাদের বংশবৃদ্ধি হয়। জীবনে একবার তারা ফিরে যায়, জন্মস্থানের টানে।

কিন্তু এবারে হোলো কী? ধূ-ধূ করছে মেঘহীন আকাশ। বাতাসের মুখও বদলেছে। গোদা-ইলিশ আর-একবার উঠে আসে জলের ওপর, একবার বাতাসে ঠিকরে লাফ দেয়, তারপরে প্রায় খাবি খেতে-খেতে আবার জলের ভেতর গিয়ে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচে।

কী দেখলে সর্দার?

উঃ কী গরম, শরীর ঝলসে যায়! গোদা-ইলিশ জবাব দেয়।

তাহলে কী হবে? এবারে কি যাওয়া হবে না? ইলিশ-গিন্নি জিগেস করে।

প্রায় চিৎ হয়ে, কান্‌কোয় জল টানতে-টানতে গোদা-ইলিশ জবাব দেয়, যেতে হবেই। ইলিশদের বাঁচাতে হবে তো!

বাঁচাতে হবে, না মারতে হবে? এক-চোখ-কানা ইলিশটা বলে।

গতবার সে জালে পড়ে কোনমতে একটা চোখ খুইয়ে পালাতে পেরেছিল।

মরতে হবে কেন? একদল ইলিশ ছেলে-মেয়ে প্রশ্ন করে।

দু-পেয়েদের ফাঁদে। কানাটা জবাব দেয়।

থাম্ তুই, ভীতু কোথাকার! ধমকে দেয় গোদা-ইলিশ, তারপর দলের দিকে ফিরে বলে, নদীর মিষ্টি জলে না গেলে আমাদের ডিমেরা বাঁচেনা, তাছাড়া সে-ই তোমাদের জন্মস্থান। নদীর মিষ্টি জলে আছে শ্যাওলা....কত নতুন নতুন পোকা। সেখানে জলের চাপও অন্যরকম, সব মিলে একটা নতুন আনন্দ।

গতবছরে-জন্মানো নতুন ইলিশেরা—যারা এখনও নদীর জলে ঢোকেনি তারা অবাক হয়ে শোনে।

কিন্তু নতুন আনন্দ যেমন আছে, গোদা-ইলিশ বলে চলে, বিপদও কম নেই। দু-পেয়েদের ফাঁদ চারিদিকে পাতা...কিন্তু মরণের ভয়ে কি নতুনের আনন্দ তোমরা চাওনা? ডিমেরা কি মজে যাবে লোনা জলে? বাড়বে না ইলিশের দল? তোমরা যাবে, না থাকবে?

আমরা তোমার পেছনে আছি সর্দার। মিষ্টি জল? দেখতে হলে কেমন সে।

বেশ। কিন্তু এবার এখনও বর্ষা নামলো না। নদীর স্রোত এখনও উল্টোমুখো, জল কম; স্রোত ঠেলে নদীতে ঢোকা মানে সোজা দু-পেয়েদের ফাঁদে গিয়ে পড়া, অথচ আর দেরি করলে সব ডিম নষ্ট হয়ে যাবে।

তাহলে কী করবে সর্দার?

দল ভাগ করে ফেলতে হবে। আমি অল্প কয়েকজনকে নিয়ে নদীতে ঢুকব। যদি পারি ত পৌঁছোব গিয়ে···কিছু ডিম বাঁচবে। আর বাকি দল অপেক্ষা করবে। যদি আকাশ কালো হয়, নামে জল, আর জল ফুলে উঠে নদীতে ঢোকে, তবেই সবাই সেই জলে ভর করে নদীতে ঢুকবে। না হলে অল্প জলে সবাই গিয়ে পড়বে দু-পেয়েদের ফাঁদে।

* * *

প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে তার মুষ্টিমেয় দলকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে গোদা-ইলিশ। চওড়া নদী ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। দু-পাশের বনভূমি পার হয়ে এল তারা। আর-একবার জলের মাথায় উঠে এসে বাতাসে লাফ মারল সে। রূপোলি বিদ্যুৎ যেন বাতাসে ঝলসে গেল।

ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না। নদীর ওপর দু-পেয়েদের নৌকোগুলো নেই, জলের ওপর কেমন যেন মরা-মরা গন্ধ।

আকাল পড়েছে নাকি ? ইলিশ-গিন্নি শুধোল।

কি জানি ? চলো,····আরও নিচে দিয়ে একেবারে মাটি ঘেঁসে !

* * *

ফিঙেরা হলুদ-বরণ মাটির দিকে চেয়ে লেজ দোলাতে-দোলাতে চলে গেল। মাটি ফেটে গেছে। বামন ধানগাছগুলো শুকিয়ে খড় হয়ে গেছে।

কী হোলো ? কি হোলো এবার ? কর্তা-ফিঙে বলে উঠল, একফোঁটা শস্যি নেই কোথাও। একটা ধানের দানা নেই।

দু-পেয়েগুলো সব মরছে দেখছ না ? গিন্নি-ফিঙে জবাব দিল।

এবার আমরাও মরব, কর্তা-ফিঙে বলে উঠল—যদি আকাশ ভেঙে জল না নামে, আমরাও গেছি !

চলো আমরা চলে যাই।

কোথায় ?

যে দেশে শস্যি আছে, যব আছে, আছে গমের শীষ।

ফিঙেরা পাখা চালায়।

* * *

নাঃ, একটা মাছের ছানাও নেই। জলের ওপর রামধনু রঙের বিদ্যুৎ খেলিয়ে ছোঁ মেরে মাছরাঙা-গিন্নি বলে উঠল।

দু-পেয়েগুলো খেয়ে ফেলেছে! কর্তা ঘাড় দুলিয়ে বলল।

এখন ছানাগুলোকে খাওয়াই কী?

এবারে ইলিশেরাও এল না। পুকুর সব শুকিয়ে গেছে। নদীর জল সব সাগরে গিয়ে শেষ হতে বসেছে। জল না নামলে এবার আর আশা নেই।

চল আমরা সাগরে চলে যাই, যেখানে আছে অনেক মাছের ছানা।

মাছরাঙা-কর্তা বলল, আর দুদিন দেখি। জল কি নামবে না?

* * *

নদীর জল যেখানে অগভীর, ভাঁটার স্রোত প্রখর, সেইখানে হঠাৎ একটা জালে এসে ধাক্কা খেল গোদা-ইলিশ। সে সকলের আগে দলকে চালিয়ে নিয়ে চলেছিল। চেঁচিয়ে উঠল সে—ফাঁদ··· ফাঁদ! নেমে যাও····মোড় ফেরো। হায় হায়, ইলিশেরা মরল এবার!

* * *

একফালি পিঙ্গল চাঁদ ম্লান আকাশের পশ্চিমে হেলে পড়েছে। তারারা নিভু-নিভু। একটা ঠাণ্ডা দমকা হাওয়ায় নৌকোটা নড়ে উঠল। পৃথিবী যেন বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। জালের মধ্যে থেকে গোদা-ইলিশ জলে একটা কাঁপন অনুভব করল। একটা শব্দ আসছে না? ক্ষীণ সাঁ সাঁ একটা শব্দ? যুদ্ধের ঘোড়া যেমন দামামার শব্দে স্ফীত নাসিকায় কেশর ফুলিয়ে হ্রেষা ছাড়ে, গোদা-ইলিশ তেমনি গর্জে উঠল। বন্দীত্বের বেদনায় ছট্‌ফটিয়ে উঠল সে।

নৌকোর ওপর থেকে শোনা গেল, ইলিশ, ইলিশ! জালে ইলিশ পড়েছে!

সেই সময় পৃথিবী কাঁপিয়ে এল ঝড়ের দমকা হাওয়া, দু-ফোঁটা আকাশের স্বেদ খসে পড়ল প্রথমে। তারপরে আকাশ ভেঙে নেমে এল জল। আর নদীর স্রোত ঘুরে গেল। শান্ত নির্জীব নদীতে এল যৌবন। হু হু করে ছুটে এল জল—ফুলে, ফেঁপে, ফেনিয়ে। আর জালের মধ্যে ছট্‌ফট করতে করতে উঠে যেতে যেতে গোদা-ইলিশ দেখল, এসে গেছে তার দল।

ফেণাময় শুভ্র ঢেউয়ের মাথায় ছুটে চলেছে রূপোলি ইলিশের ঝাঁক, হাজারে-হাজারে, লাখে লাখে। তাদের ডিম হবে···লাখে-লাখে ডিম নদীর মিষ্টি জলে। গেলই বা দুচারজন দু-পেয়েদের ফাঁদে!

ঊষর নবজাত আলোয় রূপোলি দেহ তার একবার চিক্‌চিক্ করে উঠল, তারপরে কান্‌কো ফেটে রক্তে লাল হয়ে গেল তার দেহ।

মরুভূমির ময়ূর

ছোট ছোট পাহাড়ের টিলা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে, তারি মাঝে-মাঝে একটু-একটু বনানীর নীলিমা। দুচোখ যেদিকে যায়, রাজপুতানার দিগন্ত-ছড়ানো মরুভূমি। মরুভূমির মাঝে-মাঝের সেই সব নীল বনে চরে বেড়ায় ময়ূরের দল। পৃথিবীর যেমন সেখানে বাঁধন নেই, ময়ূরের দল তেমনি অবাধ স্বাধীন। মরুভূমির তপ্ত বালিতে তারা ছুটে বেড়ায়, বাতাসে ডানা ঝাপটে উড়ে যায়। সূয্যিঠাকুরের আলো তাদের সাতরঙা পেখমে পড়ে রামধনু হয়ে ঠিকরে যায়।

ময়ূরসর্দারের ছেলে আর দলের আর-একটা ময়ূরীকে একদিন পাখী-ধরায় ধরে নিয়ে গেল।

দু-পেয়ে মানুষ কি বোঝে জানোয়ারের অবাধ স্বাধীনতার দাম? খোলা খাওয়ার স্বাধীনতা কি ভালবাসা দিয়ে মেটানো যায়? একটা দাঁড়ে দুচোখ বেঁধে এনে যখন সেই ময়ূর আর ময়ূরীকে মানুষের গোলমালে বিক্রি করে যাওয়া হল, তখন একটা মানুষের খোকা অনেক আদর করে তাদের ছোলা গম আর চাল খেতে দিয়েছিল। কিন্তু প্রায় দু-দিন কিছু তারা ছোঁয়নি। তারপরে বাগানে বাঁশের বেড়া দিয়ে সবুজ রং করে তাদের জন্যে হল মস্ত ঘর। সেখানে তারা একটু চলে-ফিরে বেড়াতে পারে বটে, কিন্তু কোথায় আকাশ? কোথায় সেই দিগন্ত-ছড়ানো চকমকি মরুভূমি? প্রথম দুদিন ময়ূর আর ময়ূরী শুধু খুঁজল একটু পালাবার ফাঁক। খাবার রইল পড়ে। তাদের না-খাওয়া খাবারের গন্ধে-গন্ধে প্রথমে এল একটা মেঠো-ইঁদুর।

এই ইঁদুরটাই তাদের প্রথম বন্ধু।

তারপর মানুষের খোকাটা একদিন একরাশ ধড়ফড়ে জ্যান্ত মাছ তাদের জন্যে দিয়ে গেল। পেটুক ময়ূরী আর লোভ সামলাতে পারেনি, কিন্তু ময়ূর হল সর্দারের বাচ্ছা। সে তার তরল সাতরঙা গলাটা ফিরিয়ে নিল। খাবারের লোভে তার উদ্দেশ্য ভোলবার বাচ্ছা সে নয়।

মাছের গন্ধে-গন্ধে এলো একটা বেরালছানা। বেরালছানাটা ভিক্ষে জানিয়ে বললে, মি আউ।

সর্দারি চালে পা ফেলে এসে, ময়ূর ঠুকরে একটা মাছ তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বেরালটার পানে। বাঃ, জিনিষটার গন্ধ ত মন্দ নয়! ময়ূর খেতে শুরু করল, কিন্তু কাতর বেরালছানার কথা ভুলে গেল না। সেই থেকে বেরালছানাটা তাদের দ্বিতীয় বন্ধু।

সকালে মাছের সময় বেরালের বরাদ্দ বাঁধা হয়ে গেল, আর বিকেলে ছোলা গম আর চালের খুদকুঁড়ো মেঠো-ইঁদুরের।

কিন্তু এই বন্দী হয়েই কি জীবনের শেষ? কোথায় খোলা মরুভূমি ;— আকাশের উজ্জ্বল নীল আর বালির রুক্ষ গেরুয়া যেখানে মিলে ধোঁয়াটে-ধোঁয়াটে হয়ে কাঁপে?

বন্ধু ইঁদুরই প্রথম দেখালো পথ। সে আসত বেড়ার নিচে ছোট্ট একটা সুড়ঙ্গ কেটে। ময়ূরের মাথায় বুদ্ধি খুলে গেল। ওই তো, ওই সুড়ঙ্গের ওপারে নীল আকাশ, তারপরে তারার ইসারায় ইসারায়, কালপুরুষের কোল বেয়ে রাজপুতানার মরুভূমি কতদূর? ময়ূর আর ময়ূরী লেগে গেল সুড়ঙ্গটা বড় করতে। সকাল নাগাদ মাটির স্তূপ জড়ো করে ফেলল তারা। ময়ূরীর দেহটা ছোট, সে-ই গলে বেরিয়ে আসছিল প্রথম। ঠিক সেই সময় দু-পেয়ে মানুষের খোকাটা তাদের খাবার নিয়ে আসছিল, দেখতে পেয়ে মহা হৈচৈ বাধিয়ে তুলল। ময়ূরীও ভয় পেয়ে খাঁচার কোনে পালিয়ে বাঁচেনা। ধেয়ে এলো কালো পা, ধেয়ে এলো লাল পাড়ে জড়ানো গৌর দুটি চরণ, ফটফটিয়ে ধেয়ে এলো শুঁড়তোলা চটি।

কর্তাবাবুই বুদ্ধি দিলেন, এক কাজ কর। বাঘার ঘরটা এনে ময়ূরের ঘরের সামনে বসিয়ে দে, বাঘা পাহারা দেবে।

সেই থেকে বাঘার ঘর এসে বসল ময়ূরদের ঘরের সামনে। ঘাড়টা ডাইনে কাৎ করে ময়ূর একবার দেখে নিল বাঘাকে। শিকারী বাঘা ঘরের ভেতর থেকে গলা বার করে বলল, ইয়্যাপ্ ইয়্যাপ্! অর্থাৎ ব্যাপারখানা কী?

ময়ূর হঠাৎ চমকে ডানা ঝটপটিয়ে উঠল। চট করে সাবধানী বাঘার মুখ ঘরে ঢুকে গেল। ভেতর থেকে আওয়াজ এল—ঘর্‌র্ ঘেঁা-ও-ও।

অর্থাৎ—সাবধান! খবরদার! ভয় দেখিওনা আমায়।

কেটে চলল দিন। ফুলন্ত ফাগুন ফলন্ত বোশেখে পা দিল। গরমের আমেজ এনে দেয় জন্মভূমির আভাস। ময়ূর আর বাঘা দুজনেই দুজনকে রেখেছে চোখে-চোখে। সয়ে এলো দুজনের দুজনকে। চোখে-চোখেই ইসারা হয়। বাঘা বলে—ভৌ! উ! ভোঃ! অর্থাৎ তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই জেনো। কিন্তু ওই হতভাগা বেরালছানাটাকে হাতের গোড়ায় পেলে…! আর দেখ, পালাবার নামটি কোর না। কী করব বল, মনিবের খাই পরি……… ভুঃ ভুঃ! গ্‌ র্‌ র্!

সর্দারি চালে ময়ূর ঘাড় দোলায়। বাঘা তাদের তৃতীয় বন্ধু।

বন্ধু বেরাল এবার দেখালো পথ। সেদিন মাছের লোভে এসে পড়বি-ত-পড় একেবারে বাঘার সামনে। বাঘা বললে—ভো-ও-ও ভো! অর্থাৎ—বাছাধন, আর যাবে কোথায়! কিন্তু বেরালের লাফের কথা বাঘা জানত না। বেরাল একলাফে একেবারে ময়ূরের বেড়ার মাথায় উঠে শরীরটা এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে খাঁচার ভেতর গলিয়ে দিল। গায়ের চাপে বেড়ার সেখানটা ফাঁক হয়ে গেল। সেই দিন থেকে ময়ূরেরা লাফানো অভ্যাস করতে শুরু করল।

ময়ূরেরা ফাঁকাটা লক্ষ্য করে লাফায় দিনের পর দিন। কাছাকাছি লাফিয়ে ওঠে তারা, কিন্তু পায়ে কোন আশ্রয় পায়না। বাঘা প্রশ্ন করে—ভোঃ ভোঃ ? অর্থাৎ, ও কী হচ্ছে ? এমন তো কথা ছিল না !

সময়ের পালে লাগে হাওয়া। রোদে পোড়া আকাশ আষাঢ়ের মেঘে সজল হয়ে ওঠে। সেই মেঘ ময়ূরদের মনে এনে দেয় মরুভূমির বুকে নাচের উল্লাস।

খাঁচার মধ্যে ময়ূর সেই প্রথম মেলে দেয় তার পেখম, বিদ্যুৎ চমকে যায়, রং ঝলমলিয়ে ওঠে।

সেই বর্ষায় বাগানে সেবার এলো শত্রু। বন্ধু ইঁদুরের পেছনে তাড়া করে এলো এক প্রকাণ্ড গোখরো সাপ। বাঘা তার কাঠের ঘরে শুয়ে সামনের থাবা-দুটো চাটছিল। হঠাৎ তার কাণ দুটো খাড়া হয়ে উঠলো ;—"ভো-ও-ও ?" কে যায় ওখান দিয়ে ? একলাফে বাঘা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পর-মুহূর্তে ই নিমেষে কুঁকড়ে ঘরে ঢুকে গেল। গোখরোটা শিকারে বাধা পেয়ে ঘরের সামনে ফণা তুলে দুলছে! ভেতর থেকে ভেসে আসছে বাঘার ক্রুদ্ধ গর্জন ! ময়ূরও দেখেছে শত্রুকে। ডানা দুটো ঝাপটে একটা কর্কশ শব্দ করে উঠল সে। শত্রু ! বিষধর শত্রু সামনে ! বন্ধুরা তাদের বিপন্ন ! ফাঁকটা লক্ষ্য করে প্রাণপণে লাফ মারলো ময়ূর। শত্রুর আক্রমণ দিয়েছে শরীরে নতুন তেজ। গলাটা তার বেরিয়ে এল ফাঁক দিয়ে। পড়ন্ত শরীর ডানা ঝাপ্‌টে সামলে নিল সে। তারপরে অনেকগুলো পালক খসিয়ে দেহটাকে বার করে নিয়ে এল। ময়ূরীর শরীর হালকা, সঙ্গীর পেছু নিতে তার দেরি হয়নি। মুক্তি ! মুক্তি এতদিনে! কিন্তু বিপন্ন বন্ধুকে তারা বিষধরের সামনে ফেলে যেতে পারেনা। বাঘার ভুল হয়েছিল, তার ছোট ঘরটায় ঢুকে। সে তখন কোণঠাসা।

হিস্‌ করে বিষধর গোখরোর ছোবল তখন নামছে! সেই উদ্যত ফণা লক্ষ্য করে বাজের মত লাফিয়ে পড়ল ময়ূর। তীক্ষ্ণ চঞ্চু আর ধারালো নখের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সাপটার দেহ।

কয়েকটা মুহূর্ত। গা-ঝাড়া দিয়ে বাঘা বেরিয়ে এল। আষাঢ়ের নববর্ষা চমকে থেমে গেছে। বাঘা বললে—ভুঃ ভুঃ ভুঃ। অর্থাৎ খুব বেঁচে গেছি! তারপরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, ভোঃ ও ও! আরে, তোমরা কোথায় গেলে?

ময়ূরেরা তখন পাখা চালিয়েছে। সজল আকাশেই তখন মুক্তির আস্বাদ। তারারা আজ উঠবে না। কালপুরুষ মেঘের আবরণে ঢাকা। কিন্তু মরুভূমি তাদের ইসারায় ডেকেছে। উজ্জ্বল ঝকঝকে মরুভূমি। উত্তপ্ত গেরুয়া বালি আর নীল আকাশ যেখানে দিগন্তে মিশে ধোঁয়াটে-ধোঁয়াটে হয়ে কাঁপে।

হিমের দেশের তিমি

আমার এক আমেরিকান বন্ধুর কাছ থেকে এই গল্পটা আমি শুনেছিলাম। সে আবার শুনেছিল হিমের দেশের একটা রেন্ পাখির কাছে। আমার বন্ধুটি তখন একটা হোয়েলার জাহাজ করে বেরিং সাগর পাড়ি দিচ্ছিল, সেই সময় ঝড়ের ঝাপটায় একটা রেন্ পাখি জাহাজে এসে পড়ে। মুমূর্ষু পাখিটাকে দু-দিন গরমে রেখে খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ করে তুললে উড়ে যাবার আগে গল্পটা বলে যায় রেন্ পাখি। রেন্ পাখি ছোট্ট হলেও সত্যি কথা বলতে জানে।

সুমেরু রেখা পার হয়ে, বরফান বেরিং সমুদ্দুরে ব্যাপারটা ঘটে। সেখানকার ধূ ধূ উত্তাল ঢেউ-এর মাথায় ভেসে আসে বড়-বড় বরফের পাহাড়। ক্বচিৎ কখনও দেখা যায় সেই বরফের পাহাড়ের মাথায় ভেসে চলেছে এক-আধটা শাদা ভালুক। সীল মাছের দল সাঁতরে চলে ঢেউ-এর মাথায় মাথায়। রাত্রিহীন রুক্ষ আকাশের তীক্ষ্ণ বাতাসের মুখে উড়ে যায় দু-একটা রেন্ পাখি আর সেই বিশাল সমুদ্দুরের উত্তাল ঢেউয়ের তালে-তালে স্বচ্ছন্দে ভেসে চলে জলের রাজা তিমি মাছ।

শঙ্খ ছিল সেই তিমিরের রাণী। সুমেরু সাগর থেকে বেরিং প্রণালী দিয়ে বেরিং সাগর পর্যন্ত তার একচ্ছত্র অবাধ গতি। সুমেরু সাগর যখন শীতে জমে যায়, শঙ্খ তখন তিমির দল চালিয়ে নিয়ে বেরিং সাগরের দিকে এগিয়ে চলে। নীলচে জলে তার শ্বেত শরীর সমুদ্দুরের তালে-তালে বিশাল একটা ডুবোজাহাজের মত উঠতে-নামতে থাকে। ঠিক তার পেছনেই থাকে তার বাচ্ছা সমুদ্রজিৎ।

মাঝে মাঝে ফুসফুসে হাওয়া ভরে নিতে ভুস্ করে ভেসে ওঠে

তারা। সাগরের কালো জলের ওপর শঙ্খর বিশাল দেহটা তখন যেন মনে হয় ছোটখাট একটা দ্বীপ।

সমুদ্রজিৎ মাঝে মাঝে ছট্‌কে এগিয়ে যেতে চায়। শঙ্খ ধমকে ওঠে, যাসনে, যাসনে ওদিকে। সমুদ্দুরের টান দেখে চলতে হয় তিমিদের, আর আকাশের ঝোড়ো হাওয়া। একবার ভুল টানে পড়লেই একেবারে গরম সাগরে গিয়ে পড়ে সেদ্ধ হয়ে যেতে হবে!

গরম সাগর কী মা? সমুদ্রজিৎ জিগ্যেস করে।

সে আছে। এই তিমিদের বরফান সমুদ্দুর পার হয়ে সে এক ভয়ানক ফুটন্ত জলের মেলা। সেখানে মানুষ বলে একরম দু-পেয়ে জানোয়ার ঝিনুকের খোলায় চড়ে ভেসে বেড়ায়।

এইখানে আমার আমেরিকান বন্ধুটি রেন্ পাখিকে জিগ্যেস করেছিল, সে আবার কী? ফুটন্ত জলের সমুদ্দুর—সে আবার কোথায়?

রেন্ পাখি হেসে বলে, তিমিরা কিনা সুমেরুর ঠাণ্ডা সাগর ছেড়ে বেশীদূর যেতে পারে না, তাই সুমেরু-রেখার দক্ষিণের সমুদ্দুরের জল তাদের কাছে ফুটন্ত গরম বলে মনে হয়।

এদিকে পথে তিমিদের সঙ্গে সমুদ্দুরের ঘোড়া দাঁতাল সিন্ধু-ঘোটকের দেখা।

সিন্ধুঘোটক শুধোয়, কিগো তিমিরাণী, বসন্ত-সাগরে চলেছ বুঝি?

শঙ্খ জবাব দেয়, হ্যাঁ।

উত্তরে সাগর কেমন?

হোঃ হা! তিমিদের রাণী ফোয়ারার মত খানিকটা জল ছিটিয়ে দেয় আকাশে। বলে, দেখছনা, উত্তর-পশ্চিম বাতাসে বেগ ধরেছে। সমুদ্দুরের জলে সর পড়ে এল। বরফের পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা লেগে গুঁড়োচ্ছে হুড়মুড়!

হুম্! গোঁফ নেড়ে সিন্ধুঘোটক হৃদয়ঙ্গম করে অবস্থাটা; তার পরে বলে, খোকা সাঁতার শিখল কেমন? দেখো বাপু, মানুষের কয়েকটা ঝিনুকের খোলা এবার দেখা গেছে দক্ষিণ সাগরে।

ফুঁঃ করে বাতাসে একরাশ জল ছুঁড়ে দিয়ে এগিয়ে চলে শঙ্খ। বলে, ঝিনুকের খোলার এত শক্তি নেই যে এই বরফের রাজ্যে মাথা গলাতে আসে।

* * * *

সুমেরু রেখার ঠিক দক্ষিণে যেখানে সুমেরুর হিমাক্ত জল আর বেরিং সাগরের তরলতা পরস্পরের গায়ে আছড়ে পড়ছে, যেখানে তরল জল জমে যেতে ভেঙে যায়; সেইখানে সাগরের নিচে ছড়িয়ে পড়ে তিমির দল। ছোট-ছোট মাছের ঝাঁক খেয়ে পরমানন্দে ঘুরে বেড়ায় তারা।

আমার আমেরিকান বন্ধুটি এইখানে জিগ্যেস করে আবার, তিমিরা বুঝি ছোট মাছের ঝাঁক খায়?

পরম জ্ঞানীর মত মাথা নেড়ে নেড়ে ছোট রেন্ পাখি বলে, ওমা, তাও জান না? তিমিরা মস্ত হাঁ করে সজোরে মুখের ভেতর জল টেনে নেয়, সেই সঙ্গে ছোট মাছের ঝাঁক চলে আসে তাদের মুখের ভেতর; তারপরে মুখ বন্ধ করে জালি-কাটা দাঁতের ভেতর দিয়ে মুখের জল বের করে দেয় তারা। মাছের ঝাঁক আটকে থাকে মুখের ভেতর। এ না হলে কি আজ সমুদ্দুরে জল থাকত? যে-হারে ডিম পাড়ে ছোট মাছের ঝাঁক, সে-হারে জলজন্তুরা তাদের খেয়ে না ফেললে আজ সমুদ্দুরে জল না থেকে থাকত শুধু ছোট মাছ।

রেন্ পাখি ছোট হলে কী হয়, পরম জ্ঞানী।

তারপরে একদিন।

সেদিন শঙ্খ সমুদ্দুরের কোলে ভেসে উঠে রোদে পিঠ দিয়ে পড়ে ছিল—হঠাৎ তার নজরে পড়ল, একটা তিমি বেগে ছুটে আসছে

তাদের দিকে। দু-পাশে সাগরের ঢেউ আথাল-পাথাল। দূরে যেন জলের মাথায় আগুন লেগে গেছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে কালো ধোঁয়া; আর সেই ধোঁয়ার নিচে ওই তো কি ছোট্ট একটা ঝিনুকের খোলার মত!

ওই, ওই কি সেই দু-পেয়ে মানুষের ঝিনুকের খোলা? এতটুকু? একেই এত ভয় সিন্ধুঘোটকদের, সীল মাছেদের? ফুঃ! তারা সব হল ছোট্ট প্রাণী! কিন্তু সে তিমিদের রাণী,—বিশাল, বিস্তৃত তার দেহ। এক আছাড়ে সে গুঁড়িয়ে দিতে পারে ওই ঝিনুকের খোলাটাকে। ভাবতে-ভাবতে শঙ্খ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মানুষের সেই ছোট হোয়েলার জাহাজটার দিকে। হঠাৎ দুম্ করে আকাশ ফাটিয়ে একটা শব্দ। সঙ্গে-সঙ্গে জল আছড়ে তীব্র চীৎকার করে ওঠে শঙ্খ। প্রচণ্ড বেগে কি যেন একটা এসে বিঁধেছে তার শরীরে! সে ত জানে না মানুষের হারপুনের কথা!

সাগরের জলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে একদিকে ছুট মারে সে জল কেটে। তীরটাকে ঝেড়ে ফেলার যথেষ্ট চেষ্টা করে, কিন্তু যতই সে দম হারিয়ে ছোটে, কি যেন একটা কড়-কড়, কড়-কড় করে অনুসরণ করে তাকে। এও সে জানে না যে, এই হারপুন-বল্লমের পেছনে লাগানো আছে লোহার তারের কাছি। রক্ত-ক্ষয়, ভয় আর দম হারানোর ফলে নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে সে।

সেই সময় থেকে শুরু হয় অবশ্যম্ভাবী টান। আর সেই টানে প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যেও সে দেখে যে সমুদ্রজিৎ তার পেছনে আসছে।

শঙ্খ চীৎকার করে ওঠে, যা সমুদ্রজিৎ, যা পালা! তিমির দলকে সরে যেতে বল্। আর সিন্ধুঘোটককে বলিস সে যেন তোকে তোর বাকি শিক্ষাটুকু দেয়। একদিন তিমির দলকে চালাতে হবে তোকেই।

তারপরে প্রচণ্ড টানে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে হোয়েলার জাহাজটার দিকে নিস্তেজ শরীরে এগিয়ে যেতে থাকে সে।

কুমির

খড়কাইএর বন ভেদ করে পাহাড়ের দল দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। পাহাড়ের কটি বেড়ে বন বিস্তৃত বিশাল। লতাপাতার চাঁদোয়া ভেদ করে সূর্যের আলো সেখানে সসম্ভ্রমে প্রবেশ করে। দেবদারু বনের ভেতর দিয়ে ফ্যাকাশে চাঁদ সুদূর, ভুতুড়ে বলে মনে হয়। পাতার রাশির মধ্যে দিয়ে শন্‌শন্ করে বাতাসের চলাচল যেন জীবন্ত বনভূমির একটা দীর্ঘশ্বাস। সেই মানুষহীন সাম্রাজ্যে যুগ-যুগান্তর ধরে জানোয়ারদের অবাধ বিচিত্র জীবন। বসন্তের মাঝামাঝি বাদা আর বিলগুলো পাখির দলে ভরে যায়। সবুজের ঝিলিক দিয়ে আসে টিয়ার দল। তেরঙা তিতিরের ডাকে ঘুমন্ত বন সচকিত হয়ে উঠে।

নদী পার হয়ে পশ্চিমে গরান আর হিন্তালের বনে গণ্ডারের আড্ডা। দক্ষিণে সুদূর-প্রসারিত সুঁদরির বন। সুঁদরির বনে সূর্যকে আবাহন জানায় বনকুক্কুট....হরিণেরা গাছের ফাঁকে-ফাঁকে চকিত বিদ্যুতের মত চমকে চলে যায়। বুনো-কুকুরের আর্তনাদে ভুতুড়ে বন রি-রি করে উঠে আর অকস্মাৎ কেঁদো-বাঘের গম্ভীর গর্জনে প্রতিধ্বনিত বন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

নদীর উপর কেওড়া গাছের দল জড়াজড়ি করে ঝুঁকে পড়েছে। দিনের আলোতেও অন্ধকারের প্রাধান্যই বেশি সেখানে। জোয়ারের সময় নদীর জল কেওড়ার বনে ঠেলে ঢোকে, আবার উজিয়ে নেমে যায়। তখন সেখানে প্রচুর কাদা, আর সেই কাদার ভেতর মহানন্দে লুটিয়ে পুটিয়ে বাস করে কুমির। পূবের আকাশে সৃষ্টির প্রথম দিনের বৈচিত্র্য নিয়ে সূর্য উঁকি মারে। এই জলময় জগতে তার আভা গলিত

রূপোর মত চিকচিকিয়ে মিলিয়ে যায়। সৃষ্টির প্রথম সন্ধ্যার বিশাল ঔদাসীন্য নিয়ে কাদার ভেতর সূর্যের প্রকাণ্ড স্বর্ণগোলকটা ডুবে যায়। অনেক-অনেক পাখির কলরবে ভরে ওঠে আকাশ। লোলচর্ম কাদা-মাখা আদিম সরীসৃপটা নির্বিকার পড়ে থাকে। তার শরীরে স্পন্দন নেই···নেই চাঞ্চল্য···সময় তার কাছে মূল্যহীন।

কখনো বা কোনো সময় একটা হরিণ নদীতে জল খেতে এলে নিঃশব্দে নড়বড় করে কুমিরটা জলে নামে। ডাঙা থেকে জলে নামার সময় কিন্তু তার অদ্ভুত এক তীর্যক তীব্র গতি। এতটুকু একটা বুদ্বুদও উঠে না জলে। আর অতর্কিতে একটা কাঁটাময় ল্যাজের ঝাপ্‌টায় পিপাসী জানোয়ারটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে জলে আছড়ে পড়ে। তাকে কামড়ে ধরে কুমির তখন ডুব মেরেছে নিচে।

দুপুরের তীক্ষ্ণ রোদে কাদা-মাখা পিঠটা পেতে হাঁ করে পড়ে থাকে কুমির। ঈষৎ লালছে সাদা সারি দেওয়া সুতীক্ষ্ণ দাঁতগুলো তার দেখা যায়। তারই ফাঁকে-ফাঁকে কয়েকটা ছোট পাখি কি যেন খুঁটে-খুঁটে খায়। কুমিরটার মুখে তখন যেন একটা তৃপ্ত আরাম····

সেবার কুমিরটার দুটো বাচ্চা হয়েছে তখন। হরিণেরা চালাক হয়ে গেছে। এদিকটায় আর তারা খেতে আসে না। বাচ্চা দুটোকে বুকের কাছে আগলে কুমির কাঁচের মত অনড় চোখে দিগন্তে তাকিয়ে থাকে একটা শিকারের আশায়। সামনে দিয়ে ভৈরব জলকল্লোল আবর্তের পর আবর্ত রচনা করে নাচতে নাচতে ঘুরতে-ঘুরতে এগিয়ে চলেছে। দূরে—বহু দূরে, জলের উপর কালো একটা পোকার মত কী ভেসে যায়? সড়াক করে পিছলে কুমির জলে নামে। জল কেটে, স্রোত ঠেলে অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতিতে সে ভেসে চলে। নাকের ডগাটা তার মাত্র শুধু জলের উপর ভেসে আছে। পোকার মত কালো রেখাটা দ্রুত বড় হতে থাকে।

আজ দীর্ঘ ভোজ সামনে। ওটা একটা মরা মহিষের বাচ্চা? কিন্তু অমন স্রোত কেটে ঠিকভাবে ওটা কূলের দিকে এগিয়ে চলেছে

কী করে ? কুমির গতি বাড়িয়ে দেয়। তারপর যখন সেই মরা মহিষটা প্রায় গিয়ে কূলে ঠেকেছে, কুমির এসে তার একটা পা কামড়ে ধরে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা তীব্র ক্রুদ্ধ গম্ভীর গর্জনে বন প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। একটা কেঁদো-বাঘ ওপার থেকে মহিষ-ছানাটা মেরে পিঠে করে সাঁত্‌রে এপারে নিয়ে আসছিল, নিজের ডেরায় বসে খাবে বলে। অকস্মাৎ এ কী বিপদ! বাঘটা এক লাফে ডাঙায় উঠে শিকারের আর-এক অংশ কামড়ে ধরে প্রচণ্ড বেগে টান লাগায়। ডোরা কাটা কেঁদো-বাঘ পৃথিবীর বলবান জানোয়ারদের এক। আর সেই প্রচণ্ড টান........কিন্তু একবার ধরবার পর ক্ষুধার্ত কুমিরের মুখ থেকে শিকার টেনে নেওয়া ? শিকার কামড়ে ধরা অবস্থাতেই জল থেকে কুমিরের আধখানা দেহ ডাঙায় উঠে আসে........পর-মুহূর্তেই সামলে নেয় কুমির। পায়ের পাঁচটা করে সমস্ত আঙুল সে কাদায় গেঁথে দিয়ে চাড় লাগাতে থাকে। শিকারকে কামড়ানো অবস্থায় কণ্ঠের ফাঁক দিয়ে বাঘের তীব্র ক্রুদ্ধ গর্জনে বন কেঁপে-কেঁপে ওঠে। হয়ত আর-একটু হলেই মহিষ-ছানাটার দেহ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে দুই পরাক্রান্ত প্রাণীর ক্ষুধা মেটাতে পারত, কিন্তু বাঘটা হঠাৎ যেন পাগলা হয়ে শিকার ছেড়ে চকিতে কুমিরটাকে আক্রমণ করে বসল। তার একটা কারণও ছিল। প্রথমত বনের রাজা কেঁদো-বাঘ ভয় কাকে বলে জানে না, দ্বিতীয়ত তার সাম্রাজ্যে, তার শিকারের উপর এসে ভাগ বসাবে আর-এক জানোয়ার ? তার প্রচণ্ড টানে হয়ত বা কুমিরটার দেহ আর-একটু উঠে এসেছিল, কিন্তু বাঘ দেখল, এই সুযোগ! নিমেষে শিকার ছেড়ে সে এক প্রচণ্ড লাফে এসে কামড়ে ধরল কুমিরের একটা পা। সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়ল চাবুকের মত কুমিরের সেই কাঁটাময় ল্যাজের প্রচণ্ড এক ঝাপটা। বাঘ পিছলে গেল আর দুটো প্রকাণ্ড সাঁড়াশির মত বিশাল একটা হাঁ-করা মুখ সজোরে নামল তার মাথার উপর।

তারপর সে এক অদ্ভুত টানাটানি। বাঘ বেপরোয়া থাবা চালিয়েছে

কুমিরের পিঠের উপর······সে-থাবায় হাতীর পিঠ ভেঙে যায়········ কিন্তু কুমিরের প্রচণ্ড চর্মে তা কার্যকরী নয়। সমস্ত শরীরের মত্ত হাতীর বল নিয়ে সে কুমিরটাকে ডাঙার দিকে টানতে লাগল। সে ডাঙার জানোয়ার। একবার—একবার যদি সে কুমিরটাকে টেনে ডাঙায় এনে উল্টে ফেলতে পারে······জাঁতিকলে কামড়ানো থাকা অবস্থাতেই শরীরে প্রচণ্ড মোচড় দিল সে। ক্রূর নিষ্ফল ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে বন কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

আর কুমিরের তখন আধো-উল্টোনো অবস্থা। সে জানে, একবার যদি বাঘটা তাকে উল্টে ফেলতে পারে তাহলে তার নরম পেটের অংশ ঐ বাঘের থাবায় ফালা-ফালা হয়ে যাবে। কিন্তু সে জলের অধিপতি। একবার—একবার যদি সে টেনে পিছ্‌লে বাঘটাকে জলে নামাতে পারে····

দূরে হিন্তালের বনে গণ্ডার চমকে আকাশে তাকাল। বন-কুক্কুটেরা কোটরে আশ্রয় নিয়েছে। ত্রস্ত চকিত হরিণের দল। আকাশে একদল শকুন কোথা থেকে এসে ঘুরছে মাথার উপর চক্রাকারে। আর, দিগন্তে চিরন্তন ঔদাসীন্য নিয়ে বিশাল স্বর্ণকায় সূর্য তখন অস্তোন্মুখ।

বাঘের প্রচণ্ড মোচড়ে প্রায় যখন কুমির উল্টে গেছে, তখন হঠাৎ একটা মড়-মড় শব্দে কুমিরের সেই যাঁতাকলের মত মুখের ভেতর বাঘের মাথাটা পিষে গেল·······সড়াক করে শত্রুকে পিছলে টেনে নিয়ে জলের ভেতর নেমে গেল কুমির। গভীর, গভীর নীল নদীর তল, নিজের শাশ্বত স্বচ্ছন্দ এলাকা। শিকার মুখে রেখে জলের ভেতর পা-গুলো ছুঁড়ে খেলিয়ে নিল সে। একটা পা তার প্রায় সম্পূর্ণ থেঁত্‌লে গেছে।

পরের দিন পূবের আকাশে সৃষ্টির প্রথম দিনের বৈচিত্র্য নিয়ে যখন সূর্য আকাশে ওঠে, নদীর জল গলিত রূপোর মত উদ্দাম আবর্তে নেচে চলে,—দেখা যায়, কাদার ভেতর শরীরটা ডুবিয়ে, বাচ্ছাদুটোকে বুকের কাছে আগলে নিয়ে সেই বিশাল সরীসৃপটা অনড়, কাঁচের মত চোখে দিগন্তে তাকিয়ে আছে নির্বিকার।

সমুদ্দুরের কাছিম

মাছেরা হেসেই মরে।

কাৎলার পেটুক খোকাটা বলে, এ কী রকম জানোয়ার রে বাবা! সেদিন একটু গভীর জলে ছানাটাকে গিয়েছি তেড়ে, ও মা, কোথায় কালো মাথা আর কোথায় পাখনা! কি যেন একটা তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে!

ফরফরিয়ে এক ঝাঁক পুঁটি-মাছের বাচ্ছা হালকা জলে ডুল্‌কি চালে যেতে-যেতে বলে যায়, রুই-কাৎলার ছানাগুলো বড় চালিয়াৎ! গভীর জলে আবার যায় নাকি?

হাঠাৎ ভুস করে জল ঠেলে কি যেন একটা পাহাড় ভেসে ওঠে!

একটা কাছিম।

শ্রান্ত মেঘের শ্রান্তির সুবিধে নিয়ে আড়ালে-আড়ালে অস্তসূর্য একটু হেসে উঠেছে। আকাশের একমুখে ঘন কালো হুমকি আর একমুখে যেন দুষ্টু ছেলের হাসি। দিঘির বুকে ঝুলন্ত গাছের শাখা বেয়ে বিশ্রান্ত বৃষ্টির ফোঁটা পাতায় পাতায় পিছলে নেচে-নেচে মুক্তোর ফোঁটা হয়ে দিঘির জলে চক্ররেখা সৃষ্টি করছে। ঘন বর্ষার পর ওই অদূরে উচ্ছ্বসিত নদী-জলের কলরোল। আকাশের যেখানে কালো মেঘের দল হুমকি দিয়ে আছে, তারই কোল বেয়ে একদল সাদা বকের ঝাঁক ঝলকা তুলে মন্থর পাখায় পাড়ি দিচ্ছে আল্‌তো ভাবে—যেন কাশের ফুল হাওয়ায় ভেসে চলেছে।

এ-রকম আকাশ-ভাঙা জলের পর আর কি জলচরেরা গভীর জলে থাকতে পারে? এক-একটা দমকা বাতাস দিঘির জলে ঢেউ তুলে

ভেঙে ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে। কাছিমের বাচ্চাটা বেজায় খুশি। ঢেউয়ের এক-একটা লাফে সে যেন আকাশ পরশ করে নিতে চায়!

কী মজা!

কাছিম-গিন্নির কোঁচকানো গলাটা সাবধানে একবার জলের ওপর উঠে আসে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে—নাড়ির টান যাবে কোথায়?

এ কী ঢেউ দেখছিস? যদি দেখতিস সমুদ্দুরের ঢেউ! তোরও আর সে ভাগ্যি হলনা! আমরা হলুম সমুদ্দুরের প্রাণী, ঢেউয়ের মাথায় আকাশ ছুঁয়ে অতল-তলে তলিয়ে গেছি। এখন কপাল মন্দ, তাই পচা পুকুরে রুই-কাৎলার সঙ্গে বাস করছি!

কাছিমের খোকাটা অত-শত বোঝে না; তবু নদীতে যখন জোয়ার আসে আর বাতাসে বয়ে নিয়ে আসে সামান্য নোনা জলের সুবাস, মনটা অস্থির হয়ে ওঠে—কী যেন সে হারাচ্ছে। সে শুনেছে, কেমন করে একবার আকাশ ভেঙে পড়েছিল, আর বানের জলে মাটি আর জল হয়ে গিয়েছিল একাকার! সেই সময় বানে ভেসে তার মা পড়ে দিঘিতে।

চল না মা, আমরা সমুদ্দুরে চলে যাই! কাছিম-খোকা মাকে বলে।

—কী করে যাব?

—কেন, পায়ে হেঁটে! আমরাও কম তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না!

কাছিম-গিন্নি খোকার কথা শুনে হাসে,—যেমন করে দিঘির জলে পুঁটি-মাছ চমকে চলে যায়, চড়াই যেমন করে আকাশে বিদ্যুতের মত বাঁক নেয়, তেমনি ডাঙায় জানোয়ার আছে তাদেরই মত ছুটতে পারে। আমরা ভারী মানুষ, তাদের সঙ্গে পারব কেন?

—হুঁ, এমন ছুট মারব! কাছিম-খোকা অবিশ্বাসের সুরে বলে।

—ও বুদ্ধি করিসনি। বিশেষত ডাঙার দু-পেয়ে জানোয়ারগুলো বড় শয়তান। ওদের কাছে খোলার মধ্যে ঢুকেও পার নেই। এখানেই এখন থাক্, আবার যদি দিন আসে, বানের জলে সব একাকার হয়ে যায়, আমরা ভেসে পাড়ি দেব সমুদ্দুরে—যেখানের জল নুনের মত মিষ্টি।

কাৎলার ছানাটা কাছিম-খোকার মাথার ওপর দিয়ে লাফ মেরে

যেতে-যেতে বলে যায়, হুঁঃ, নোনা জল আবার মিষ্টি! জলসিক্ত দেহ তার সূর্যালোকে ঝল্‌সে ওঠে।

—একবার যদি কামড়ে ধরতে পারি! কাছিম-খোকা বলে। কাৎলাটার জ্বালায় কোনো মিষ্টি খাবার পাবার জো নেই!

কাছিম-গিন্নি কোঁচকানো ঘাড়টা এদিক-ওদিক নাড়তে থাকে। গাছের আড়ালে একটা দু-পেয়ে জানোয়ার বিড়-বিড় করে বলে যায়, —দিঘিতে মাছ উঠেছে। তার নজরে আসে না।

হঠাৎ কোথা থেকে মন-মাতানো খাবারের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে। পুঁটির ঝাঁক ঠে লকাছিম-খোকা ছোটে—ওই তো! ওই তো!

পর-মুহূর্তে মুখের গ্রাস কেড়ে কাৎলার পেটুক বাচ্ছাটা ছোঁ মারে আর লাফাতে লাফাতে উঠে যায়। রাগে কাছিম-খোকার গা রি রি করতে থাকে। এবারে সে দেখবে কেমন করে কাৎলার ছানা খায়! মুখিয়ে থাকে সে।

তারপরে কী সব ওলট-পালট হয়ে যায়। প্রচণ্ড টানে সে ওপরে উঠে এসেছে একটা কলরবের মাঝে—কাছিম! কাছিম!

দু-পেয়ে জানোয়ারগুলোর হাতে সে আঁকু-পাঁকু করতে থাকে।

কাছিমরা কাৎলাদের মত ও-রকম চঞ্চল নয়। তারা অপেক্ষা করতে জানে। দু-পেয়ে জানোয়ারদের হাতে পড়লে পরিণতি কী, কাছিম বাচ্ছার তা জানা না থাকলেও সেটা যে খুব সুবিধাজনক নয়, অনুভূতি দিয়ে সে বুঝতে পারে। বিশেষত কাৎলার ছানাটার কাণ্ড দেখে মাঝে মাঝে প্রাণের ভয়টা দ্বিগুণ হয়ে আসে। তবু চৌবাচ্চাটার তলায় সে নিথর হয়ে পড়ে থাকে। স্থৈর্য কাছিমদের জীবনে একটা পরম আশ্রয়।

দু-পেয়ে জানোয়ারগুলোর ভাষা সে বুঝতে পারেনি; কিন্তু ব্যবহারে বুঝেছে যে তারা আপাতত বন্দী। কাৎলাটাকে চৌবাচ্চায় বেঁধে রেখে গেছে; আর কাছিম লাফাতে পারে না, তাকে চৌবাচ্চার নিচে ফেলেই খালাস।

কখন তারপরে রাতের অন্ধকারে আকাশের কালো মেঘের দল ছড়িয়ে পড়তে থাকে, কেউ জানে না। দু-একটা উঁকি-মারা ভীরু তারার মুখ কখন মুছে যায়। তারপরে জল নামে মুষলধারায়।

সে কী জল! ভৈরব নদী গর্জে ওঠে,—বাতাসে নোনা জলের স্বাদ!

কাৎলাটা থেকে-থেকে লাফিয়ে মরে। আর কাছিম-বাচ্ছার রাগে শরীর রি-রি করে ওঠে! এই তো সেই সময়, সেই জলে আর ডাঙায় একাকার হয়ে যাওয়া।

একটু-একটু করে চৌবাচ্চা ভরে উঠছে, এই সময় কাৎলার ছানাটার লাফানোর শব্দে যদি দু-পেয়েগুলো ধেয়ে আসে?

কাছিম-বাচ্ছা হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে এসে কাৎলার মুখে বাঁধা দড়িটা অন্ধকারে কামড়ে ধরে। কাৎলাটা প্রাণপণে লাফাতে থাকে। কাছিমের কামড়! দড়িটা ছিঁড়ে যায়। আর-একটা লাফ—হঠাৎ কাছিম-বাচ্ছা অনুভব করে,—সে বন্দী, একা।

কতটুকু আর? ঐ দু-পেয়েগুলো মশাল নিয়ে ধেয়ে আসছে না? আগুন—যা চিরকাল জানোয়ারদের কাছে রহস্যময় ভীতি!

চৌবাচ্চাটা শনৈঃ-শনৈঃ ভরে আসে। আর সেইটুকু সময়ে কাছিমেরও ধৈর্য আর বাগ মানে না। তারপরে চার পাশ বেয়ে চৌবাচ্চার জল উপছে পড়ে। আর সেই জল বেয়ে নেমে আসে কাছিম। জল বেয়ে চলে নদীর পানে, আর ভৈরব-কল্লোলিত নদী ছুটে চলে সমুদ্দুরে, ঢেউ যার আকাশ ছুঁয়ে গভীর অতলে তলিয়ে যায়।

দুয়ে দুয়ে শূন্য

পাল-তোলা মেঘ নীল সাগর থেকে উঠে নীল আকাশে ভেসে পড়েছে, আমরা পাল্লা দিচ্ছি তার সঙ্গে। কাশবনে ঢেউ তুলে হাওয়া তাড়া করেছে আমাদের পিছনে, দু-পাশে সোনালি সবুজ ধানের ক্ষেত। অনেক দূরে খেলাঘরের রেলগাড়ির মত একটা ট্রেন পাগলা মোষের মত ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলে গেল, ডোবার ওপর একটা শরের ডগায় বসে একটা দোয়েল টুপ টুপ করে ল্যাজ দোলাচ্ছে। আমরা ফিন্ ফিন্ করে ছুটে চলেছি। আমাদের পেছনে পড়ে রইল কত আঁকা-বাঁকা খাল, কত লতা-ঢাকা একশো বছরের বটের ছায়া আমরা পেছনে ফেলে এলাম, কত—হাজার বছরের—বাঁশের গরুর গাড়ি ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে কাঁচা রাস্তায় সবেগ মন্থর গতিতে চলতে চলতে অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমাদের দিকে, কত রাখাল ছেলের মেঠো গান ধুলোয় ঢাকা দিয়ে আমরা এগিয়ে এলাম—হাজার হাজার বছরের শান্ত গ্রাম—আমাদের গতির ঢেউ লাগল না তাদের মনে। হ্যাঁ লেগেছিল—একটা গরুর হঠাৎ কি খেয়াল হল আমাদের দেখে, ল্যাজটা শূন্যে তুলে দিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে মারল ছুট পশ্চিমের পানে। পশ্চিম আকাশে তখন কালচে লালের রেখা পড়েছে, তারও নিচে ধূসর।

আমরা সাইকেল-টুরে বেরিয়েছি। পূজোর ছুটি।

পটু বলল—পা-দুটো ঠিক সীসের মত ভারী হয়ে গেছে! কাছাকাছি গাঁ আর কতদূর?

—কাছেই হবে, গরু চরছে দেখতে পাচ্ছিস না? বলল রমি।

রমির দিকে চেয়ে পটু বলল—গরু তো আমার পাশে-পাশেই চলছে অনেকক্ষণ থেকে।

পটুর পাশাপাশি যাচ্ছিল রমি।

—চলছে তো বলিনি, চরছে।

—ওই চরতে গেলেই চলতে হয়। তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চরতে পারিস ?

ওপাশ থেকে লালমণি বলল—কিন্তু গাঁয়ে পৌঁছলেই বা কী হবে ?

—কেন ?

—আমি সীটের সঙ্গে আটকে গেছি।

—সে কী রে ?

—হ্যাঁ! তোরা আমাকে নামিয়ে নিয়ে সাইকেল শুদ্ধ শুইয়ে দিস।

পটু আমার দিকে চেয়ে বলল, ওই দোলগোবিন্দ তোর সীটের নীচে একটা চাঁট মারলেই, সীট থেকে ছেড়ে ছিটকে পড়বি, দেখতে হবে না।

আমার নাম গোবিন্দ, ছেলেবেলায় মা কোনদিন ভুলিয়েছিল কিনা জানি না, এরা নামের আগে বিশেষণ যোগ করার সময় কেউ সে খোঁজ নিয়েছিল কিনা তাতেও আমার সন্দেহ আছে; কিন্তু সকলের এক মতে, উপায়ের অভাবে নির্বিবাদে হয়ে গেছি দোলগোবিন্দ। ভবিতব্যকে স্বীকার করাই ভাল।

সামনের মাঠে খানিকটা দূরে একটা ছেলে একপাল গরু নিয়ে ফিরছিল, আমি তাকে ডাকলাম—হুই!

গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই মেঠো ডাকটা আমরা আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম।

ছেলেটা এল মাঠ পার হয়ে পথের ওপর। আমাদেরই বয়সী হবে, কিন্তু চেহারাটা দেখবার মতন। লিকলিকে সরু সরু হাত পা, পরনে একটা নেংটি আর উদরের পরিধিটা বিশাল।

—কী কও কর্তা ?

—সামনের গাঁয়ের নাম কী রে ?

—নাম ? জাননা ?

—জানলে কি মস্করা করছি ?

—সোনারং কয়।

—কয় ?

—উঁ।

—এখান থেকে কতদূর আর ?

—দূর ? জাননা ?

—খুব জানি, তবু একবার চাঁদবদনে বল ?

—এই, এক-পোয়া পথ।

—এক পোয়া !

—উঁ।

পটু বলল—পথ কি দুধ ?

রমি বলল—পথ কি তেল ?

—পথ কি গুড় ? বলল লালমণি।

—আধ-সের নয়ত ? আমি জিগেস করলাম।

পটু বলল—ওরে, ওর ভুঁড়িটা দেখছিস ? রোজ এক-পোয়া পথ খেয়ে-খেয়ে করেছে।

ছেলেটা হঠাৎ মাঠের দিকে টেনে ছুট মারল আর যেতে-যেতে আমাদের উদ্দেশে যে কথাটা বলে গেল সেটা এখানে না বলাই ভাল।

সোনারঙে আমরা যখন ঢুকলাম তখন সূয্যি ডুবে গেছে, পথে অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে আর আকাশের ছায়াপথে অজস্র তারার বাতি জ্বলে উঠেছে। একটা বাড়ির দরজায় এসে আমরা কড়া নাড়লাম। দূরে একটা ঝোপে অজস্র জোনাকি চিক চিক করছে। ভিতর থেকে সাড়া এল—কে ও ?

—আজ্ঞে আমরা।

—আমরা ?

—হ্যাঁ আমরা।

—তবে ত ধন্য হয়ে গেলুম, বলতে বলতে এক বৃদ্ধ দরজা খুলে আমাদের সামনে দাঁড়াল। আমাদের সাইকেলের বাতি না থাকলে অন্ধকারে তাকে দেখতেই পেতাম না। কারণ বুড়ো অন্ধকারের চেয়েও কালো।

—কী চাই বাপু?

—আজ্ঞে আজকের রাতটা আমরা আপনার এখানে থেকে যেতে চাই।

—ওঃ, এই সামান্য কথা? আর কী চাই? কিছু খাবে-দাবে না?

—নিশ্চয় নিশ্চয়, আমরা সমস্বরে গেয়ে উঠলাম।

—লুচি, পাঁঠা, পুকুরে জাল দিলে দুটো পঁচিশ-সেরী কাৎলাও উঠতে পারে।

পটু বলল—আর নিশ্চয় দই পাওয়া যায়?

—খুব, খুব।

—আর পান্তুয়া কিছু, লালমণি বলল, বেশি নয় ছ-টা করে, তা আর বেশী কি?

—কিচ্ছু না কিচ্ছু না!

রমি আমার কাণে কাণে বলল, বুড়ো খুব মাই-ডিয়ার আছে, না রে?

আর বুড়ো গর্জে উঠল—তোমরা কে হে বাপু? হঠাৎ যেন ট্রেন চলতে চলতে হল কলিশন।

আমি জবাব দিলাম—আজ্ঞে আমরা টুরিস্ট।

—কি?

—টুরিস্ট।

—ডেঁপো ছোকরা! আবার ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে?

—কই আমি ত.........

—আমিও টুরিস্ট, বুঝেছ ছোকরা, দুটো রিস্ট আমারও আছে আর আমার রিস্ট দুটো তোমাদের থেকে অনেক চওড়া। আর

আমার দুটো রিস্ট ছাড়া আরও দুটো জিনিষ আছে। কুকুর, বুঝেছ? ভাগো, ভাগো সব স্বদেশী ডাকাত!

বুড়ো সশব্দে দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল। বাংলার লোক নাকি অত্যন্ত অতিথি-পরায়ণ। কিন্তু সোনারঙে আমরা দেখেছিলাম উল্টো। কিন্তু তা-বলে আমরা অন্যান্য গ্রাম সম্বন্ধে হতাশ হইনি। একটা নিয়মের ব্যতিক্রম নিয়মের নিয়মত্বই প্রমাণ করে। সোনারং ছিল একটা ব্যতিক্রম। গ্রামের প্রায় ঘরে-ঘরেই সেই একই ব্যাপার—কেউ থাকতে দিতে রাজি নয় এবং শেষ পর্যন্ত খোঁজ নিয়ে জানা গেল গাঁয়ের জমিদার-বাড়িটা অনেক দিনের পোড়ো হয়ে পড়ে আছে, সেখানে ইচ্ছে করলে আমরা গিয়ে থাকতে পারি। বাড়িটা সম্বন্ধে যদিও অনেক অপবাদ আছে, তবে স্বদেশী ডাকাতদের আবার প্রাণের মায়া কী?

সারাদিনের পরিশ্রমে দেহ ভেঙে পড়েছিল, আমরা নিরুপায় হয়ে ঠিক করলাম, ওই ভূতের বাড়িতেই থাকা যাবে। নেহাৎ একা ত নয় আমরা, চারজন একসঙ্গে আছি; তার পরে যা থাকে কপালে। মানুষের আতিথেয়তা ত দেখা গেল, এবার দেখা যাক ভূতের।

অন্ধকার ঠেলে জমিদার-বাড়ি এসে যখন আমরা উঠলাম তখন রাত গাঢ় হয়েছে। দূরে কোথায় একদল শেয়াল একসঙ্গে ডেকে উঠল। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির ভাঙা সিংদরজা দিয়ে ভেতরে পা দিয়েই গা-টা ছম-ছম করে উঠল। ঠাণ্ডা একটা শ্যাওলার গন্ধ।

রমি বলল—ও ভাই!

—কী রে?

—ভয় করছে।

দূর, ভয় কী? বলতে বলতে আমরা চারজনে আরও গা ঘেঁসাঘেঁসি করে এলাম। সঙ্গে সম্বল চারটে সাইকেলের বাতি।

নিচেটা এত ঠাণ্ডা আর এত অন্ধকার যে প্রতিপদেই যেন মনে হয় ঘরের কোণগুলোতে কারা সব লুকিয়ে আছে অদৃশ্য জীব।

এক-একটা মুহূর্ত যেন এক-একটা নিস্তরঙ্গ যুগ! আমরা কাঁপছি। ঘরের দরজায় আবির্ভাব হল এক সাদা মূর্তির। অন্ধকারে মূর্তিটার সাদা রেখা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

—হুম্!

আমার গলা দিয়ে কোন-মতে বার হল—কে?

—ভূত!

—কি করছ তুমি এখানে?

—ভয় দেখাচ্ছি।

—কেন, আমরা কী করেছি?

—কিছু না।

—তবে?

—ভূত ভয় দেখাবে না? হুম! হি হি হি হি!

মূর্তিটা ঘরের মধ্যে এক পা বাড়ালো।

—আর এগিও না। আমি বললাম।

—কেন?

—কামড়ে দেব।

ওদিকে আমার দাঁতে দাঁতে তখন ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

—কামড়ে দেবে?

—হুঁ।

—তোমার দাঁতে ধার আছে?

—ভীষণ!

—তবে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে কেন?

—ও কিছু নয়, ক্ষিধে পেয়েছে বলে।

—ক্ষিধে পেয়েছে? এতক্ষণ বলনি কেন?

মূর্তিটা হঠাৎ যেন উবে গেল। বাইরে ঘন অন্ধকার।

আর পাঁচ মিনিট পরে ভুম করে একটা পুঁটলি পড়ল। খুলে দেখি পুঁটলিতে একরাশ মুড়ি আর নারকেল। খাবার দেখে ক্ষিধেয়

আমরা সোজা ওপরে উঠে গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ি-ঘরগুলো সেকেলে, নিচু-নিচু, তার চারপাশ ঘিরে গাঢ় অন্ধকার নিঃশব্দে গোলমাল শুরু করেছে। আমাদের বাতির আলোর রেখাগুলোকে দেখে সেই ঠাণ্ডা অন্ধকার যেন অট্টহাসি হেসে উঠল। ক্লান্ত শরীরে সামনে যে ঘরটা পেলাম সেটাতেই ঢুকে পড়লাম—ধূলোয় ভরা নিরাভরণ ঘর। কোনো রকমে মেঝের খানিকটা ধূলো ঝেড়ে আমরা সেখানেই শুয়ে পড়লাম—ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুম এসে আমাদের সব অভিযোগ দূর করে দিল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ পটুর চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল—কে আমায় লাথি মারল, ওরে বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে লালমণিও চেঁচিয়ে উঠল—আমাকেও, আমাকেও!

রমিও চেঁচাতে শুরু করল—আমাকেও মেরেছে, ও বাবারে!

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। সাইকেলের বাতিগুলো নিভে এসেছে। সেই স্তিমিত অন্ধকারে দেখি, পটু চোখ বুজিয়ে চেঁচাচ্ছে আর দুমদাম করে হাত-পা ছুঁড়ছে। কখনও লাথি পড়ছে রমির গায়ে কখনও লালমণির গায়ে। আমি বললাম—এই পটু, কী হচ্ছে কী?

সোঁ সোঁ করে একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকল, হুড়মুড় করে ঘরের একটা জানলা ভেঙে নিচে পড়ে গেল। সঙ্গীরা তখন উঠে বসেছে। হঠাৎ নিচে থেকে একটা শব্দ হল—হুম্! উঁ!

আমাদের মুখে আর কথা নেই, কাছাকাছি ঘেঁসে বসেছি!

রমি বলল—ও কী?

আবার শব্দ হল—হুম্ হুঁ উ! আর মনে হল শব্দটা যেন সিঁড়ি দিয়ে আসছে। সিঁড়িতে কার পায়ের আওয়াজ বেজে উঠল দুম দুম করে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—কে?

কোনো সাড়া নেই।

আর সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ভয়ঙ্কর শব্দটা এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

আমাদের পেট আবার জ্বলে উঠল কিন্তু বুক তখনও দুর দুর করে কাঁপছে। খাব কি না ভাবছি, হঠাৎ দরজার পাশ থেকে গলা শোনা গেল—খেয়ে নাও বলছি! কড়া গলা।

আমরা চটপট খেতে লেগে গেলাম—কি জানি, ভূতকে সন্তুষ্ট করাই ভাল।

মুড়ি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি চুপি চুপি সঙ্গীদের বললাম—বেশ ভাল ভূত, না রে?

পটু বলল—চলে গেল নাকি?

আমাদের তখন একটু সাহস ফিরে এসেছে। যে ভূত খেত দেয় সে নিশ্চয় কোন অনিষ্ট করবে না। আমি সাড়া দিলাম—ইয়ে! ও ইয়ে.......

সাদা মূর্তিটার একটুখানি দেখা গেল দরজায়।

—ইয়ে কি? চালাকি হচ্ছে আমার সঙ্গে? নাম ধরে ডাকতে পার না?

—নাম কী?

—কী আবার? ভূত।

—ও! তা ভাই ভূত, তুমি কী করছ?

—ছুরি শান দিচ্ছি।

বুকের মধ্যে রক্ত চল্‌কে উঠল।

—ছুরি কেন?

—তোমাদের কাটা হবে না? খাইয়ে-দাইয়ে পাঁঠা মোটা করলাম, এবার বলি দিতে হবে।

কী বলা যায় ভাবছি, কারণ ওর সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলতে পারি ততক্ষণই জীবনের আশা। কোনরকমে পূব আকাশ একবার ফর্সা হলেই জানি ভূত আর থাকতে পারবেনা। কিন্তু এখন ও ছুরি শানাচ্ছে।

পটু হঠাৎ বলে উঠল—ছুরি কেন? ঘাড় মটকাতে ভুলে গেছ বুঝি?

মূর্তিটা বোধহয় এক মুহূর্ত কি ভাবল, তারপরে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে এল—ঘাড় মটকানো বড় গোলমেলে, তার চেয়ে ছোরা দিয়ে গলার নিচে—কুচ্! চমৎকার!

রমি বলল—কেন আমরা কী করেছি?

জানলা দিয়ে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগল। আমি পূবের দিকে তাকালাম, ভোর হতে আর দেরি নেই।

মূর্তিটা বলল—কিচ্ছু করনি।

—শুধু-শুধু তুমি আমাদের মারবে?

আমি বললাম—ভেবে দেখ, আমাদের মারলে আমাদের মা কাঁদবে, বাবা কাঁদবে, দাদা কাঁদবে, বৌদি কাঁদবে, বৌদির দিদি কাঁদবে আর শ্বাশুড়ি কাঁদবে, তার ছেলে কাঁদবে তার শালা কাঁদবে……

পটু শুরু করল—আর ঝন্টু আমার সাইকেলটা নিয়ে নেবে কাঁদতে কাঁদতে—

---ঝন্টু কে?

—আমার ছোট ভাই।

—আর মন্টু আমার ফাউনটেন পেনটা নিয়ে নেবে, আর—আর—

আমি আবার চালালাম—আর আমার কুকুরটা কাঁদবে, তার ছানাগুলো কাঁদবে, আমাদের ফুটবল ক্লাব কাঁদবে, ফুটবলটা কাঁদবে, মাঠ কাঁদবে, কলেজ কাঁদবে… ……

হঠাৎ মূর্তিটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—ওরে আমার সোনাতন রে—এ—এ—

কী হল, কী হল? সোনাতন বুঝি তোমার ছেলে? মরে গেছে বুঝি?

—না সোনাতন আমার ছাগল, তাকে খেয়ে ফেলেছি।

—ঘাড় মটকে?

—না, কেটে। ওরে আমার সোনাতন রে—এ—এ--

—দেখ তা হলে, আমাদের কেটে তুমি-শুদ্ধ কাঁদবে।

—হুঁ তাই তো দেখছি।

—তাহলে ভাই ভূত, তুমি আমাদের ছেড়ে দেবে তো ?

—না।

—ছাড়বে না ?

—না।

—কিছুতেই না ?

উঁ, ভূতটা একটু ভেবে বলল, ছাড়তে পারি যদি তোমরা একটা প্রশ্ন বলতে পার।

প্রাণে একটু আশা এল। পূবেও দেখি একটু বুঝি আলোর ছোঁয়া লেগেছে।

—কী প্রশ্ন ?

—দুয়ে দুয়ে কত ?

ওঃ এই! ভেবেছিলাম না-জানি কি ভূতুড়ে প্রশ্নই না হবে। বেঁচে গেলাম এবার।

বললাম—দুয়ে দুয়ে চার।

ভূতটা মাথা নাড়ল—হল না।

আমরা চারজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম—হল না মানে ? —দুয়ে দুয়ে চার ত সবাই জানে।

—না।

—তবে কত ?

—শূন্য।

—দুয়ে দুয়ে যোগ করলে শূন্য হয় ?

—যোগ করতে বলছে কে ?

—তবে কী করতে বলেছ ?

—বিয়োগ। নাও তৈরি হও ; আমার ছোরা শানানো হয়ে গেছে।

আমরা এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠলাম—কে আছ বাঁচাও! মেরে ফেললে............

কোথায় দূরে একটা মুরগি তারস্বরে চীৎকার করে উঠল, পূব আকাশে ধূসর আলোর ছোঁয়াচ লেগেছে।

আমি বলে উঠলাম—চুপ, চুপ!

—সবাই জিগেস করল—কেন ? কেন ?

—ভূতটা আর আমাদের মারতে পারবে না।

মূর্তিটা তাড়াতাড়ি জিগেস করল—কেন ?

—ভোর হয়ে গেছে, সকাল হলে কি ভূতে কিছু করতে পারে ?

—ভোর হয়ে গেছে ? ভূত জিগেস করল।

—হ্যাঁ, ওই দেখ না আলো, আর ওই শোন মুরগি ডাকছে।

—তবে বড় বেঁচে গেছ।

ভূতটা তখনও অন্ধকারই ঘরের মধ্যে থেকে ছুম ছুম করতে করতে নিচে নেমে গেল। আর আমরা প্রায় তার পেছনে মরি-কি-বাঁচি না ভেবে প্রাণপণে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি সামনে সেই সাদা মূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে। বাইরে অনেক লোক জড় হয়েছে, বোধহয় আমাদের চীৎকারে।

আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম—ভূত! ভূত!

একজন লোক জিগেস করল—কই ?

—ওই যে সামনে!

—ও তো পাগলা হরিদাস।

অ্যাঁ! পাগল ?

—একদম!

দেখি, আপাদমস্তক গায়ে কাপড় জড়িয়ে পাগলা হরিদাস গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে—হরি বল মন রসনা.........

সকাল হয়ে গেছে। ধানের ক্ষেতে সোনালি রোদ উঠেছে, আমরা পেছনে ফেলে এসেছি সোনারং। আকাশের মেঘের সঙ্গে

পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছি আমরা। পাশের ঝোপের মধ্যে থেকে একটা পাখি ডাকছে—কুক্ কুক্! শঙ্খচিল উড়ছে আকাশে। জলার ধারে ধার্মিক বক নিথর পাথরের মত বসে আছে। চিক চিক করছে সবুজ ঘাসের মধ্যে একটুখানি রূপোলি জল। আমরা সব পেছনে ফেলে চলেছি। সামনে আমাদের ডাকছে সামনের রহস্যময় আবছা মায়া!

শিম্বার শেষ

মালভূমিটার ওপর দিয়ে চলে গেছে বিষুবরেখা। সূর্যের রক্তচক্ষু সেখানে বর্ষণ করে আগুনের হল্‌কা, আর তাই বোধহয় সেই অগ্নিবর্ষী সূর্যের রক্তচক্ষুকে বাধা দেবার জন্য গড়ে উঠেছে, যতদূর চোখ যায়—বিশাল সমতল বন। দীর্ঘ আকাশ-ছোঁয়া গাছের দল ঘন হয়ে সূর্যকে বাধা দেয়। বেঁটে মোটা সবুজ বাহু বিস্তার করে ছায়া বর্ষণ করে শ্যামল গাছের দল। জলার জল তবু কেঁপে-কেঁপে বাষ্প হয়ে আকাশে উঠতে থাকে, আবার মেঘ হয়ে বনের মাথায় বৃষ্টি রূপে ঝরে পড়ে। প্রখর সূর্যালোকে আর বৃষ্টিতে বন বেড়ে চলে। বড়-বড় ঘাস জন্মায়। মানুষের মাথার সমান ঘাস। সূর্যতাপে সেই ঘাসের দল হলুদ-বরণ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে, আবার বৃষ্টির জলে সবুজ সতেজ হয়ে সূর্যকেই আবাহন জানায়।

এই ঘাসের ভেতর থাকে শিম্বা। মহারাজ শিম্বা, সিংহদের রাজা; একটা অতিকায় মার্জার। এই বনের সে একচ্ছত্র অধিপতি। প্রথম প্রভাতে তার গুরু গম্ভীর ডাকে বন কেঁপে-কেঁপে ওঠে, আর সেই ডাকের সাড়া দেয় বিদ্যুৎবর্ষী জলময় মেঘ।

শিম্বা কাউকে ডরায় না, শুধু একমাত্র ডালপালা-মেলা প্রকাণ্ড গাছটার প্রাণী—ময়াল সাপটাকে ছাড়া। ময়াল সাপটা গাছের ডালটাকে জড়িয়ে-জড়িয়ে গাছেই মিশে থাকে যেন……মনে হয়, সাপটাও গাছেরই একটা শাখা। শুধু কখনো-কখনো গাছের ডালটা জড়িয়ে সাপের মুখটা নীচু হয়ে বাতাসে শূন্যে দোলে, সেই-সময় গাছের নীচে দিয়ে কোন প্রাণী সাপটার আক্রমণ থেকে পার পায় না। পিছ্‌লে

নেমে আসে সাপটার দেহ, আর মুহূর্তের মধ্যে শিকারটা কিল্‌বিলে সাপটার মোচড়ানো দেহটার ভেতর জড়িয়ে যায়।

ওই অতিকায় বিশাল সরীসৃপটার জন্যে কতবার শিম্বা হারিয়েছে তার মুখের গ্রাস! রাগে শিম্বার কেশরগুলো ফুলে-ফুলে উঠেছে, চোখ উঠেছে রক্তবর্ণ হয়ে, কিন্তু আদিম ওই সরীসৃপটার চোখ অপলক— অনড়।

সেবার, তাম্রাভ আকাশে তখন সূর্য অগ্নিময়, সূর্যদেহ থেকে ছিট্‌কে-আসা এদিকের পৃথিবী যেন আদিম তরলিত প্রস্তর। আকাশে বাতাস নেই, সমস্ত পৃথিবীটা যেন ধুঁকছে। একটা চিতল হরিণ চলেছে জলার পানে—যেমন টুক্‌রো লোহা এগিয়ে আসে চুম্বকের দিকে। ওপাশে ঘাসগুলোর ডগায় ঈষৎ শির্‌শিরে কাঁপন। বাতাস নেই, কেন যে কাঁপন—হরিণটা লক্ষ্য করে নি। আবার কাঁপন....ঘাসের দলে ঈষৎ স্থইস্‌-স্থইস্‌ শব্দ! শিম্বা চলেছে, ওৎ পেতে। হরিণটা এগিয়ে চলে। সেই গাছতলা। গাছের একটা শাখা হঠাৎ যেন সজোরে দুলে ওঠে, আর শাখাটাই যেন সড়াক্‌ করে নীচে নেমে আসে। আবার শিম্বার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে সেই অতিকায় সরীসৃপটা! পুঞ্জীভূত রাগ কেশরে-কেশরে ফুটে ওঠে শিম্বার। ক্রুদ্ধ গর্জনে আকাশ গম্‌-গম্‌ করে ওঠে! আর হঠাৎ সটান হয়ে শিম্বা লাফ দেয় সাপটার মাথাটা লক্ষ্য করে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য ময়াল সাপটা তৈরি ছিল না, কিন্তু বনের প্রাণী, আকস্মিক বিপদে বুদ্ধি হারায় না। সাপটার ল্যাজের দিকটা সবে তখন হরিণটাকে জড়াতে শুরু করেছিল, বিদ্যুতের মতন খুলে যায় ল্যাজের বাঁধন, আর চাবুকের মতন শিম্বার শরীরে লাফিয়ে পড়ে সাপটার দেহ। মাঝখান থেকে হরিণটা বেঁচে যায়। নিমেষের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শিম্বার দেহটা ধীরে-ধীরে জড়াতে থাকে সাপটা। শিম্বাও প্রাণপণে থাবা চালাতে থাকে...... বলিষ্ঠ সনখ থাবা। ওদিকে জড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে সাপটা অদ্ভুত একটা প্রচণ্ড আকর্ষণে টানতে থাকে শিম্বাকে। শিম্বা যেন মাটির ওপর

আর পা রাখতে পারে না। প্রাণপণে নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ে ধরে সে, তবুও ধীরে-ধীরে মাটি থেকে চারটে পা তার সরে যেতে থাকে, তারপর গড়াতে থাকে—দুটো প্রাণীই। শিম্বার ক্রুদ্ধ গর্জনে ফুটে ওঠে ভয়ার্ত হুঙ্কার! মেরুদণ্ডহীন কিল্‌বিলে সরীসৃপটার শীতল দেহের কুণ্ডলী আস্তে-আস্তে তার পাঁজরা, তারপর বুকের ওপর প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকে। পাঁজরাগুলো মনে হয় গুঁড়িয়ে যাবে, ফেটে যাবে বুক! এক সময় সাপটার কদাকার বিশাল মুখখানা এগিয়ে আসে শিম্বার মুখের দিকে—চোখ দুটো অনড়…অপলক…নীল! প্রাণপণ শক্তিতে শিম্বা গড়িয়ে-গড়িয়ে নিজেকে সোজা করে নেয়, আর সাপটার কোন্ অশুভ মুহূর্তে মুখখানা সেই সময়ে নীচের দিকে নেমেছিল…একটা সজোর থাবায় সাপটার মাথাটা চেপে ধরে শিম্বা, আর মাথার নীচে, ঘাড়ের কাছে কাম্‌ড়ে ধরে সজোরে টান মারে সে। দু-টুক্‌রো হয়ে যায় সাপটার মাথাটা আর দেহটা। শিম্বা হাঁপাতে থাকে, আর মুণ্ডহীন অতিকায় সরীসৃপটার কুণ্ডলী-পাকানো দেহটা কাঁপতে-কাঁপতে শিম্বার শরীর থেকে খুলে যেতে থাকে। গা-ঝাড়া দিয়ে লাফিয়ে ওঠে শিম্বা। যাক্….শত্রুর শেষ। আকাশে মুখ তুলে জয়ের গর্জন করে ওঠে শিম্বা। সেই গর্জন মেঘ-ডম্বরুর মত বনের মাথায়-মাথায় কেঁপে-কেঁপে ছড়িয়ে যেতে-যেতে ঘোষণা করে যায়—যে-পায়ের মখমলে ধ্বনি ওঠে না, যে-পায়ের নখে মত্ত-হাতীর মাথার খুলি চিরে যায়, যে-থাবার ঘায়ে ময়ালের মাথা থেঁতলে যায়, এ সেই শিম্বার ডাক। শোনো বনের প্রাণী—মহারাজ শিম্বার ডাক। বিধাতা হাসেন।

শত্রুর তো শেষ, কিন্তু শিকার পালিয়েছে, খিদেও মেটে নি। শিম্বা ধীর-পায়ে জলার পানে এগোতে থাকে। জলার ওপর থেকে রঙে-রঙে চোখ ধাঁধিয়ে উড়ে যায় রাঙামুড়ি হাঁসের দল। জলার পারে নীচু গাছটার মাথায় নিথর বসে থাকে শাদা বকের দল, যেন কাশফুল ফুটে আছে। হঠাৎ সামনেই শিকার, না? একটা বেশ নাদুস-নুদুস সজারু-গিন্নি চলেছে জলার পানে ছানাপোনা নিয়ে।

আজ শিম্বার কপাল খুলে গেছে। এত সহজে শিকার জোটে না কোনদিন, বিশেষত মহারাজ শিম্বার গর্জনের পর সাধারণত সেদিকের বন খালি হয়ে যায়। সজারুটার সাহসও কম নয়। 'হাঁক্' করে আর-একটা গর্জন করে ওঠে শিম্বা। শিকারের এও একটা কায়দা —গর্জন করে ক্ষুদ্র শিকারকে ভয় পাইয়ে দেওয়া। সজারু-গিন্নিও তখন মহারাজ শিম্বার অবস্থিতি ও উদ্দেশ্য বুঝে নিয়েছে। কিন্তু তখন আর পালাবার পথ নেই! বাচ্চাগুলোকে পেছনে রেখে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সজারু-গিন্নি। শিম্বার মুখখানা খুশিতে ভরে উঠেছে। লাফ দিয়েছে সে, আর চকিতে সজারু-গিন্নির বেঁড়ে ল্যাজটা চাবুকের মতন একটুখানি ঘুরে যায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিস্মিত যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে শিম্বা। দেখা যায়, অনেকগুলো সজারুর কাঁটা শিম্বার মুখে বিঁধে গিয়েছে।

সজারুর কাঁটা কেউ কোনদিন লক্ষ্য করেছ? কাঁটাগুলোর গা মসৃণ মোলায়েম, কিন্তু ডগার দিকটা হাত দিলে অল্প খর্‌খরে লাগবে। অনুবীক্ষণে দেখলে দেখা যাবে, কাঁটাগুলোর মুখটা বঁড়শির মত বাঁকা। সেই কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত মুখে শিম্বা গর্জন করতে থাকে। আর যতই গর্জন করে, ততই কাঁটাগুলো আরও ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে। মহারাজ শিম্বা....ময়াল সাপ-বিজয়ী শিম্বা...এক মুহূর্ত আগে যার বিজয়-গর্জনে বন কেঁপে-কেঁপে উঠছিল, সে আজ পাগলের মত ছুটতে থাকে...

এবারে আর জল হল না। প্রখর সূর্যতাপে বন কাঁপতে থাকে। দম্‌কা ঘূর্ণী-হাওয়ায় উত্তপ্ত বালি ওড়ে। গাছে-গাছে ঘর্ষণ লাগে। সেদিন সন্ধ্যার পর এমনি দম্‌কা হাওয়ায় গাছে-গাছের ঘর্ষণে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য তখন অস্ত গেছে। বনময় পৃথিবীতে নেমে এসেছে কালো অন্ধকার। হঠাৎ অন্ধকার আলো হয়ে যায়। দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে দাবানল! পাখিরা পালাতে থাকে, প্রাণীরা পালাতে থাকে। একরাশ দাঁড়কাক কর্কশ কা-কা স্বরে বনের মাথায়

ঘুরে বেড়ায়। সারারাত ধরে সে আগুন জ্বলে। সে আগুন শিম্বার আস্তানার লম্বা ঘাসগুলোর ওপর ছড়িয়ে পড়ে। সজারুর কাঁটা-বেঁধা মুখে শিম্বা আজ তিন দিন কিছুই খায় নি। সে অনাহার-ক্লান্ত। সজারুর কাঁটাগুলো সে বার করতে পারে নি। যতরকম চেষ্টা সে করেছে, কাঁটাগুলো বিঁধে গেছে আরও বেশি। তবু প্রাণপণ শক্তিতে সে উঠে একটা আর্তনাদ করতে করতে পালাতে থাকে। তার প্রিয় ঘাসের বন পেছনে জ্বলছে! সারারাত আগুনের মালায় এদিকের বন ভূষিত হয়ে থাকে। শেষরাত্রে কিন্তু একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। দাঁড়কাকেরা থাকে উঁচু গাছের শাখায়-শাখায়। শেষরাত্রে আগুন যখন নিভু-নিভু....দাঁড়কাকের দল সেই শেষ আগুনের পানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর এক-একটা জ্বলন্ত শুকনো ডাল টেনে-টেনে নিয়ে গিয়ে জলার জলে ফেলে দিতে থাকে। দাঁড়কাকদের চেষ্টায় আগুন আর ছড়াতে পারে না। আস্তে আস্তে নিভে আসে দাবানল।

তিনদিন পরে বনের একটা প্রান্তে দেখা যায় অনেকগুলো শকুনি ভিড় করে আছে, আর অগ্নিবর্ষী সূর্যতাপে একটা সিংহের সাদা কঙ্কাল ধীরে-ধীরে লবণাক্ত হয়ে উঠছে।

কারিগর

মা-মরা শিশুপালকে বাপ দিত গালাগাল আর ঠাকুদ্দা আস্কারা। ঠাকুদ্দা মারা যাবার পর বজায় রয়ে গেল গালাগালটাই।

বাপ বলে কুড়ের বেহদ্দ, আর লোকে বলে জড়-ভরত। শিশুপালের কিছু আসে যায় না। কাছিম যেমন বিপদের সময় খোলার ভেতর আশ্রয় নেয়, শিশুপাল তেমনি আশ্রয় নিত নিজের মনের ভেতর। চাষার ছেলে লাঙল ধরতে শিখল না—বাপের গালাগাল আর চড়-চাপড়টা যখন নেহাতই অসহ্য হয়ে পড়ে তখন শিশুপালের একটা আস্তানা কামারশালা।

রুক্ষ চুল, পাথরের মত মুখ নিয়ে শিশুপাল যখন ঢোকে, সুরথ জিগেস করে, কিরে, আজ আবার হয়েছে বুঝি ?

শিশুপাল বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

নে, সাঁড়াশিটা ধর দেখি।

বুড়ো সুরথ হাপরটা চালাতে থাকে, আগুন গনগনিয়ে ওঠে।

নে, চেপে ধর। সুরথ হাতুড়ি চালায়, গনগনে লাল লোহা থেকে ফুলঝুরি ছিটকোয়। থেকে-থেকে দু-ফোঁটা ঘাম গরম লোহার ওপর পড়ে চোঁ চোঁ করে ওঠে। বিশেষ কথাবার্তার প্রয়োজন হয় না। বুড়ো আর বালকের মাঝখানে নেহাই আর হাতুড়ির ঠোকাঠুকি চলতে থাকে।

—এত বড় ছেলে হলি, বাপ-পিতামোর কাজে হাত দিসনি কেন রে ? সুরথ একদিন প্রশ্ন করেছিল।

শিশুপাল জবাব দেয়নি অনেকক্ষণ। তারপরে বলল, তুই শুধু ভাঙা লোহা পুড়িয়ে লাঙলের ফাল বানাস কেন ?

তবে কী বানাবো ?

একটা রেলের গাড়ি বানাতে পারিস না ?

সুরথ হেসে ওঠে, দূর বোকা ! লোহা পিটে রেলের গাড়ি বানানো যায় ? সে কত কল লাগে !

কলই তো বানাতে হয়। মস্ত বড় বড় কল। একটু ভেবে জবাব দেয় শিশুপাল।

সময়-সমুদ্রের ঢেউ নিস্তরঙ্গ গ্রামের বুকে আছড়ে ভেঙে ভেঙে যায়। সবুজ ধানের শীষ সোনালি হয়ে উঠে, কাস্তের হিস হিস, ছোট-খাট কলহ, মহামারি মড়ক,— গরুর গাড়ির চাকার মতই গ্রামের জীবন মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে।

ঠাকুদ্দা মারা যাবার পর ঘরে আদর না থাকলেও আহার ছিল। কিন্তু সৎমা আসার পর থেকে পথই ঘর হয়ে উঠল শিশুপালের।

একদিন সকালবেলা কোমরের কসিটা ভাল করে এঁটে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল শিশুপাল। আগের দিন রাত্রে চুপি চুপি এসে খামারের একপাশে পড়ে ছিল সে। মাকে তার মনে পড়ে না, কিন্তু ওই দাওয়ায় ঠাকুদ্দা বসে তামাক টানত। একবার শহরে গিয়ে একটা কলের গাড়ি এনে দিয়েছিল ঠাকুদ্দা। সে আনন্দ এখনও মনে আছে।

পথ।

রথবাড়ির তেঁতুলতলা পার হয়ে কামারশালা। চিরদিনের অভ্যাস মত তার পা দুটো তাকে টেনে এনেছে পরিচিত আবেষ্টনীতে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল শিশুপাল, তারপরে এগিয়ে চলল। পেছনে পড়ে রইল চেনা জগৎ। দুপাশে কচি ধানের উপর বাতাসের ঢেউ-খেলানো কলহাসি। নেহাই আর হাতুড়ির সমতালের ঠং ঠং ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। দেরিতে চষা দু-একা ক্ষেত থেকে বলদ তাড়নার আওয়াজ ভেসে আসছে—ঢি ঢি ! ছেই ছেই !

সামনে নদী। ওপারে অজানা জগৎ।

কিরে জড়-ভরত, দাঁড় বাইবি ? পদ্মমাঝি শুধোয়।

এই প্রশ্ন এর আগে অনেকবার করে পদ্মমাঝি জবাব পেয়েছে, কলের নৌকো চালাতে পারিস না? দাঁড় টেনে মরিস কেন?

ব্যাটা চাষীর ছেলে কল দেখাতে এসেছে! তুই কল দিয়ে ক্ষেত চষতে পারিস না?

চষবোই তো!

পদ্মমাঝি হো হো করে হেসে ওঠে।

কিন্তু আজ এক কথায় শিশুপাল রাজি হয়ে যায়।

দুটি পান্তা খেতে দিবি?

পদ্মমাঝির বিস্ময় চরমে ওঠে—কিরে, বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিস না তো?

দুটো পান্তা থাকে তো দেনা! কতদূর যাবি?

হুগলি তক। পাটকলে বোঝাই নেব।

পাটকল? শিশুপাল খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে,—পাটকল দেখতে দেয়? কত বড় বড় কল রে?

হেই এক-একটা হাতীপানা। হাসতে হাসতে জবাব দেয় পদ্ম,—নে ভাত কটা খেয়ে নে, এখুনি ভাঁটা লাগবে।

সেই জড়-ভরত শিশুপাল পাটকলে কুলির কাজে ভর্তি হয়ে গেল। কুড়ের বেহদ্দ, যে একদিনও লাঙলে হাত লাগাতে চায় নি, তার জীবনে কী যেন এক উত্তেজনা এসেছে! কল, কল! মানুষে বানিয়েছে এ-সব দৈত্যদের! ওই যে একটা বোতামের চাপে হাজার হাজার মণ গাঁঠ আকাশ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়! প্রকাণ্ড এক-একটা দানব যেন একটা মানুষের তোলা তর্জনীর ভয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজ করে চলেছে।

রবিবার কলে ওভার-টাইম দিয়ে কাজ চলে। সেদিন বাছা-বাছা জন-কয়েক কুলি নেওয়া হয়। ছ-দিনের কাজের পর কলগুলোর মেরামতি কাজ চলে সেদিন। সেইদিনের হাজিরায় শিশুপালের

সবচেয়ে উৎসাহ। তার সেদিনের লাভের অর্ধেক কুলি-সর্দারকে কবুল করে প্রতি রবিবারেই হাজির থাকার ব্যবস্থা করেছে সে। একদিন খোদ ওয়ার্কস-ম্যানেজারের মুখোমুখি পড়ে যায়।

কেত্না টিকেট-নাম্বার? মুখখানা লাল করে ম্যানেজার সাহেব প্রশ্ন করেন।

সেলাম ঠুকে শিশুপাল জানায়, ১০১৩।

ডাক পড়ে কুলি-সর্দারের, এই বাচ্চা কুলিটাকে প্রতি রবিবারে ওভার-টাইম দেওয়া হয় কেন?

বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে কুলি-সর্দার জবাব দেয়—এ ল্যড়কা বহুৎ আচ্ছা কাম করে। মিশিনকা আদৎ এর আচ্ছা মালুম হয়েছে।

ম্যানেজার সাহেব একটি ঘোঁৎকার ছাড়েন,—বলে দিইনি যে একই লোক প্রতি রবিবারে ওভার-টাইম পাবে না?

শিশুপাল কিন্তু দমে না। সে তখন থেকে রবিবারে গেটে টিকিট পাঞ্চ না করিয়েই ঢুকে আসে। অর্থাৎ বিনি মাইনেয় রবিবারগুলো খেটে যায়। কলগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে সে স্বপ্ন দেখে, আর চালু কলগুলোর ঘর্ঘর শব্দ তার কানে প্রভুভক্ত কুকুরের আনন্দোল্লাসের মত লাগে। কলগুলোর ভাষা এবং ক্রমে ক্রমে তাদের রহস্য তার কাছে পরিষ্কার হতে থাকে, সেই সঙ্গে কোথায় কোন কলের কী পরিবর্তন করে বা নতুন কল বানিয়ে আর কী কাজ করা যায়, তার আবছা ছায়া মাথায় ভেসে আসে। শিশুপাল যে-কলগুলোর পরিচর্যা করে তেল দেয়, ঘসে-মাজে, সেগুলো যেন সাপ্তাহিক কাজে ভাল চলে। আর তার এই কল-পাগলামি সারা কারখানায় রটে যায়। দিনের প্রারম্ভে কলগুলোকে যখন প্রথম চালু করা হয়, সে-সময়টা সে হাজির থাকতে কোনদিন ভোলে না। সেই—প্রথমে গন্ গম করে তারপরে অসংখ্য স্পন্দন তুলে মেশিনগুলোর ঘূর্ণন যেন মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চারের মতই বিস্ময়কর ঠেকে।

এমনি একটা পুরোদমে কাজের দিনে শিশুপাল বড় ক্রেনটার নিচে কাজ করছিল। কলগুলো সোল্লাসে দানবীয় গর্জন করে চলেছে। হঠাৎ তার মাঝখানে একটা অচেনা আওয়াজ কানে এল তার। শিশুপাল একটা কুলি, কিন্তু সে দাঁড়াতে পারল না। একছুটে সে ফোরম্যান কার্সন সাহেবের কাছে এল।

সাহেব, ক্রেন মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছে।

কার্সন সাহেব দূর থেকে বাঁকা দৃষ্টিতে ক্রেনটার দিকে তাকিয়ে বললেন, কে বলেছে ?

শিশুপাল নিরুত্তর।

কোন্ বোলা ? সাহেব গর্জন করে ওঠেন।

ওই, ওই শোন সাহেব! শিশুপাল উত্তেজিত স্বরে বলে।

খানিকক্ষণ লাল চোখে তাকিয়ে সাহেব গর্জে ওঠে, ভাগো !

শিশুপাল নির্বিকার মুখে এসে আবার ক্রেনটার নিচে দাঁড়ায়। আবার সেই দানবীয় সোল্লাস গর্জনের মাঝখানে একটা চিড়-খাওয়া আর্তনাদ। মেশিনের সবল ভাষার মাঝে একটা তন্ত্রছেঁড়া ক্রন্দন।

সাহেব ! শিশুপাল প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, ক্রেনটা বন্ধ করে দাও !

একটা বিরাট চড় তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে আর পড়তে-পড়তে শিশুপাল দৌড় লাগায় সোজা ওয়ার্কস ম্যানেজারের ঘরে।

—বড়া সাব ! শিশুপাল কাঁপছে।

ম্যাকডুগাল সাহেব মুখ তুলে তাকান, কেয়া হুয়া ?

সাহেব, বড় ক্রেনটা এখুনি বন্ধ করে দিতে হবে। তার চোখে কাকুতি।

কেন ? ফোরম্যান কোথায় ?

সাহেব, তুমি একবার এস।

খানিকটা ঔৎসুক্যে, খানিকটা শিশুপালের উত্তেজনায় ম্যাক সাহেব বড় ক্রেনটার কাছে এসে দাঁড়ান। চারিদিকে যথারীতি স্বাভাবিকতা,

ম্যাক সাহেবের বৃষস্কন্ধ টকটকে লাল হয়ে উঠতে থাকে—আগ্নেয়গিরির উদ্গারের আগের স্তব্ধতা। কুঞ্চিত মুখখানা শিশুপালের দিকে ফিরতে থাকে।

—ওই, ওই শোন সাহেব!

ম্যাক সাহেব ততক্ষণে ফেটে গেছেন—জল্‌দি! জল্‌দি ইলেকট্রিক কারেণ্ট কেটে দাও! বন্ধ কর বড় ক্রেন!

সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা ক্ল্যাশ্‌। সশব্দে ক্রেনটার বড় চেন ছিঁড়ে যায় আর প্রকাণ্ড একটা গাঁঠের নিচ থেকে মরণ-ক্ষীণ আর্তনাদ ভেসে আসতে থাকে। দৈত্যগুলোর গর্জন থেমে গেছে। আকস্মিক স্তব্ধতা কানকে পীড়া দেয়।

অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে।

শিশুপাল হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিল। ম্যাক সাহেব বললেন, তুমি এটা ভেবে করছ তো পাল?

ম্যাকডুগাল সাহেবের কানের দুপাশের চুলগুলোয় পাক ধরেছে, বৃষস্কন্ধে ঈষৎ শিথিলতা। শিশুপালের মধ্যের সেই কল-পাগলামি ম্যাক সাহেবই সৃষ্টির প্রেরণা বলে বুঝতে পারেন এবং তাঁর আশ্রয়ে শিক্ষায় বড় করে তোলেন।

তুমি একজন ইঞ্জিনীয়ারের সমান মাইনে পাও, ম্যাক সাহেব বলে চললেন, তুমি চাইলেই এখনি তোমার মাইনে প্রায় ডবল হতে পারে। ভেবে দেখ পাল।

না মিস্টার ম্যাক, শিশুপাল জবাব দেয়, আমি আর মেসিন চালাতে চাইনা, আমি চাই মেসিন তৈরি করতে।

ভারতবর্ষে এখনও মেসিন তৈরি হতে পারে না। কেন জমানো অর্থ নষ্ট করবে?

আমার দেশে আরও কী কী হতে পারে না, আর দশ বছর পরে তোমার কাছে জেনে যাব মিস্টার ম্যাক।

ম্যাক সাহেব হেসে ওঠেন, Well! you are a tenacious young man! (তুমি একটি জেদী ছেলে) আট বছর আগে তুমি যা-করে আমাকে সেই ক্রেনটার সামনে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে আমি ভুলিনি।

পশ্চিমে রেল লাইন যেখানটায় বাঁক নিয়েছে, যার ওপারে সূয্যি অস্ত যায়, পাতাহীন প্রায় নিঃস্ব শিমূল গাছটার মাথায় যেখানে অজস্র শকুনের আস্তানা, তারি নিচে ফাঁকা মাঠটার ঠিক মাঝখানে একটা উইয়ের ঢিপি তিল তিল করে মাথা তুলছে, ওপরে একটুখানি নীল আকাশ মুখ নিচু করে সেদিকে তাকিয়ে থাকে, চারিপাশে ছড়ানো গাছের দলকে বন বললেও বলা চলে। একদিন দেখা যায় শকুনেরা পালিয়েছে, শিমূলের শাখায় ভেঙে পড়েছে ফুলের রাশ, উই-ঢিপিটা হয়ে গেছে সমতল। মাঠে ভিত খোঁড়া হচ্ছে।

সেই মাঠে ছোট্ট একটু টিনের চালায় শিশুপালের কারখানা বসল। তারপর বছরের পর বছর সময়ের সঙ্গে প্রাণপাত যুদ্ধ। বড় জিনিষের যারা স্বপ্ন দেখে, ছোট জিনিষ অনেক সময় তাদের নজর এড়িয়ে যায় বটে, কিন্তু তা কখনও প্রকৃত স্থষ্টিকারীদের বাধা দিতে পারেনা। শিশুপালের নতুন করে এক শিক্ষা শুরু হল। বড় বড় বিস্ময়কর মেশিনের দুরন্ত ছায়া যার মনে চমকে যাচ্ছে, সে সেই প্রথম ম্যাক সাহেবের কথার সত্যতা বর্ণে বর্ণে অনুভব করল। আমাদের দেশে এখনও মেশিন হতে পারে না! মেশিন তো দূরের কথা, মিস্ত্রীদের হাতের ভাল যন্ত্র একটা আমাদের দেশে হয় না। একটা ডাইস, একটা লেদ, একটা ড্রিল, একটা ইস্ক্রুপ, এমন কি একটা আলপিনের জন্যেও আমাদের বিদেশের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। শিশুপাল প্রথমে শুরু করল যন্ত্র তৈরি করতে—সহজ সরল ও সুবিধাজনক। শস্তা মাইনের কারিগর দিয়ে বিদেশি মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কঠিন, কিন্তু শিশুপাল দমল না। তাকে বৃহৎ সংখ্যায় স্থষ্টি করতে হবে, বিদেশের

চেয়ে ভাল যন্ত্র, তবেই সে দাম কমাতে পারবে। শিশুপাল কারখানা বাড়িয়ে চলল।

এদিকে প্রথমে এল একটা চানাচুর-ওলা। ঠিক দুপুরবেলা কাজ থেকে অল্প যখন অবসর, চানাচুরওলার ওপর কারিগরের দল মৌমাছির মত ভেঙে পড়ল। তারপরে একদিন দেখা গেল বনের ভেতর অল্প জায়গায় একটা চালা উঠছে। একদল উড়িয়াবাসী ভাতের হোটেল খুলেছে। দূর গাঁ থেকে প্রতিদিন আসা যাওয়া একদিন কারিগরদের অসুবিধে ঠেকতে লাগল। মানুষের আক্রমণে বন শুরু করল জমি ছাড়তে, উঠতে লাগল ঘর। গরুর পাল তাড়িয়ে একদিন আবির্ভাব হল গোয়ালার, একটা নাপিতও এসে জমেছে। প্রতি বছরেই সংগঠনের এক নূতন উপাদান দেখা দিতে লাগল। তারপরে একদিন এক মাড়োয়ারী এসে খুলে বসল এক মুদিখানা। দেখতে-দেখতে ক্রমে গড়ে উঠল এক গ্রাম।

শিশুপালের তখন নাম ছড়াচ্ছে। পালনগরের কারখানায় ভাল লোকের ভাল পয়সা আছে—এটা রটে গেছে বহুদিন।

সময়-সমুদ্রের দশ বছরের ঢেউ চিহ্ন রেখে গেল মানুষের মনে, অভিজ্ঞতায়, আবাসে। শিশুপাল এতদিন শুধু ঢেলে গেছে, বাড়িয়ে গেছে, আহরণ করেছে বৃহত্তর সৃষ্টির উপাদান। সঞ্চয়ের শেষ সীমায় এসে সে লাভের মুখ দেখতে পেল। কিন্তু আশা তার লাভে নয়, তাকে সৃষ্টি করতে হবে, গড়তে হবে—সে কারিগর। এইবার সে আসল মেশিন সৃষ্টি করতে পারবে।

এই সময় একদিন যখন শিশুপাল তার মেশিন-শপে কি একটা নতুন-গড়া মেশিন নিয়ে ব্যস্ত ছিল, একজন এসে খবর দিল—একজন সাহেব ডাকছে।

—নিয়ে আয় এখানে। শিশুপাল আবার তন্ময় হয়ে গেছে।

—হ্যালো, পাল!

—মিস্টার ম্যাক! শিশুপাল লাফিয়ে উঠে ম্যাক সাহেবের হাতটা

চেপে ধরল। সাহেবের চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে, প্রশস্ত কপালে পড়েছে কুঞ্চন।

—দেশে যাবার আগে তোমার কারখানাটা একবার দেখে যেতে এলাম। তুমি চমৎকার ছোট-ছোট যন্ত্র বানাচ্ছ পাল। আমি আমার দশ বছর আগেকার কথাটা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হব কিনা সন্দেহে পড়েছি।

শিশুপাল হাসল,—কিন্তু তোমার কথাটাও প্রায় ঠিক সায়েব ম্যাক।

ওটা কী করছ ? ম্যাক সাহেব শিশুপালের নতুন মেশিনটায় মন দিলেন। Oh lovely ! Caterpillar tractor না ?

শিশুপাল ঘাড় নাড়ল।—তুমি কবে ফিরবে মিস্টার ম্যাক ?

আর ফিরব না পাল, আমি অবসর নিয়েছি। তোমার জন্যে সেখান থেকে কোন বিশেষ মেশিন পাঠাতে পারি ?

হ্যাঁ, ট্রাক্টরের কয়েকটা নতুন ডিজাইন।

তোমার তা দরকার হবে না। শিশুপালের নতুন মেশিনটার দিকে তাকিয়ে ম্যাক সাহেব জবাব দেন।

তারপরে একদিন,—রাত যখন গভীর, কালবৈশাখীর রুদ্র বাতাস যখন ক্ষেপে এসেছে, হঠাৎ শোনা যায়,—আগুন ! আগুন !

শিশুপালের কারখানায় আগুন ধরে গেল আর দেখতে দেখতে বৈশাখী রুদ্র বাতাস সে আগুনকে নাচিয়ে নিয়ে গ্রাস করে ফেলল সব। শিশুপাল স্থানুর মত দাঁড়িয়ে দেখল সে ধ্বংসের তাণ্ডব-লীলা। তার এত বছরের পরিশ্রম, এত সঞ্চয়, এত আশা—জ্বলে গেল তার চোখের সামনে। সেই অগ্নিবর্ণে ভেসে এল তার জীবনের ছবি—সেই চাষীর ঘর, সুরথের কামারশালা, সেই পদ্মমাঝির নৌকোয় বাড়ি ছেড়ে পালানো। তারপরে এই! সে কি হেরে গেল ? এই ধ্বংসকেও কি কাজে লাগানো যায় না ? আবার যায় না গড়ে তোলা নতুন সৃষ্টি ?

কয়েকজন কারিগর বলতে এসেছিল,—কর্তা সর্বনাশ হয়ে গেল !

শিশুপাল জবাব দিল—ঢি ঢি ! ছেই ছেই !

লোকে বলে শিশুপাল পাগল হয়ে গেছে। কারখানা ধ্বংস—সেই কারখানা, যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল পালনগর গ্রাম। গ্রামে আস্তে আস্তে ভাঙন ধরল। প্রথমে গেল গোয়ালা। মাড়োয়ারী দোকান গোটালো। হোটেলে লোক হয় না। কারিগরের দল যাযাবার পাখির মত ছেড়ে গেছে গ্রাম। নিঃস্ব শিমূল গাছটার ডালে শকুনেরা আবার আস্তানা গেড়েছে।

শিশুপালকে দেখা যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পায়ে হেঁটে পাড়ি দিচ্ছে। আর চাষের ক্ষেতে বলদ দেখলেই সে বিড় বিড় করে বলে ওঠে, টি টি! ছেই ছেই! আর রুক্ষ তপ্ত মাটি যখন সহস্র ফাটল দিয়ে হাঁফাচ্ছে, সেই সময় আকাশের চোখের কোণ নবকৃষ্ণ হয়ে এল। শিশুপালকে একদিন দেখা গেল দুটো গরুর গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে পালনগরের দিকে চলেছে। সেই দিন রাতে পালনগরের পোড়া মাঠে আবার আগুন জ্বলে উঠল—ধ্বংসের আগুন নয়, সৃষ্টির শিক্ষা। হাতুড়ি বেজে উঠল—ঠং ঠং!

বর্ষা এল ঝমঝমিয়ে, কঠিন মাটি দ্রব হয়ে গেল। আর বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর দিয়ে ঘর্ঘরিয়ে উঠল শিশুপালের নিজের হাতের ট্র্যাক্টর। ছুটে এল চাষা, ছুটের এল কারিগর। কলে জমি চষা!

টি টি! ছেই ছেই! শিশুপালের মুখে শিশুর মত হাসি।

ধ্বংসকে জয় করতে হবে তার। শকুনের দল অপরিচিত শব্দ পেয়ে উড়ে গেল সশব্দে।

যতদূর দৃষ্টি চলে সবুজ ধানের মাথায় বাতাস শিষ দিয়ে চলেছে। ধানের সমুদ্রে নদীর মৃদু হিল্লোল। গাই দুটোর নির্বিকার রোমন্থন, আর দুটো নবজাত বাছুরের অকারণ আনন্দে লাফিয়ে ছিটকে ওঠা। একজোড়া ফিঙে ধানের ঢেউয়ের নকল করে তির্যক উড়ে গেল।

শিশুপাল আবার গ্রাম বসাচ্ছে। চাষার ছেলে ফিরে পেয়েছে জমি।

বন্য

মাটি কাটার কাজ নিয়ে সেবার সাঁওতাল পরগণায় গিয়েছিলাম। জরীপ হয়ে গেছে,—মাটি ত নয় যেন বলিষ্ঠ কোন দৈত্যের রক্তাভ মাংসপেশী। দৃঢ় কঠিন, লাল কাঁকর মেশানো এক-একটা চাঙড়। রাস্তা বেরোচ্ছে ঢেউ-খেলিয়ে অজগর-সর্পিল,—শালবনের ভেতর দিয়ে, বনগুল্মের ওপর দিয়ে, দিগন্তে হারিয়ে-যাওয়া কাঁসাই নদীর কূল ঘেঁসে।

সেই সেবারেই শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। আলাপ বললাম না, কেননা আলাপ বলতে পরিচয় বোঝায়। আমি একজনের কিছু জানলাম এবং সেও আমার কিছু জানল—এই আদান-প্রদান নিয়েই পরিচয়। শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার সেভাবে আলাপ হয়নি—অর্থাৎ পরিচয়ের দান হয়েছে, প্রদান পাইনি ; কিংবা হয়ত যা পেয়েছি, তার প্রকৃত অর্থ বুঝিনি। মানুষকে মানুষ বোধহয় অত্যন্ত অসতর্ক মুহূর্তেই বুঝতে পারে।

সেইমাত্র তাঁবু খাটানো শেষ হয়েছে। সাঁওতালি সন্ধ্যার উদাস আকাশ অসীম। পূরবীর মীড় টান যেন পৃথিবীর অন্তরের হাহাধ্বনি ব্যক্ত করছে। কাঁসাইয়ের ঢালু তটে একটা পাখি টি-টি করে ডাকছে। কুলিরা আগুন জ্বালাচ্ছে, তাঁবুর ভেতর বিশ্রাম করছিলাম, এমন সময় তাঁবুর ধারে যেন কার অস্তিত্ব অনুভব করলাম।

—কে ? কে ওখানে ?

নতশির, দীর্ঘদেহ, ঋজু গৌরকায় এক বৃদ্ধ তাঁবুর পরদা ঠেলে এসে সামনে দাঁড়ালো।

আমার নাম শ্রীনাথ ভট্টাচার্য।

কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে ছিলাম।

বাঙালী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এসব পরগণাও একদিন বাংলার ভেতর ছিল।

কী চাই আপনার ?

কাজ।

কী কাজ পারবেন আপনি ? কাশফুলের মত সাদা মাথার দিকে চেয়ে বললাম।

সামনের বনের ভেতর দিয়ে আপনার রাস্তা যাবে। ও-বন আমার জানা।

কিন্তু কী কাজ পারবেন আপনি ?

মাটি কাটা।

হেসে উঠলাম।—হঠাৎ চেয়ার-শুদ্ধ আমার দেহটা শূন্যে উঠে গেল। দেখি, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য আমাকে শুদ্ধ চেয়ারটা খানিকটা তুলে ধরেছে আর যেন ঠিক চেয়ারের নিচে থেকেই দুটো কালো সাপ হিস্-হিস্ করতে-করতে বাইরের জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটেনি। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে চেয়ারটা নামিয়ে দিয়ে বিনীত গম্ভীর স্বরে শ্রীনাথ ভট্টাচার্য বলল, ভয় পেয়েছে। ভয় না পেলে কিছু বলে না ; বোধহয় বেরোতে পারছিল না।

সাপ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। গোখ্‌রো।

অদ্ভুত সন্ধ্যাটা থম্‌থমিয়ে জমে উঠল। বিগত বিপদের সূচনায় নয়, শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের আবহাওয়ায়।

আপনি ব্রাহ্মণ ?

ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম।

লেখাপড়া জানেন ?

যা জানতাম ভুলে গিয়েছি। নতুন করে শিখছি আবার।

এই জঙ্গলে নির্বান্ধব নিরালায় কী শিখছেন ?

হাতটা ঈষৎ হেলিয়ে ভট্টাচার্য বলল, এই সব !

কাঁসাইএর ওপর থেকে ভেসে আসছে রহস্যময় উদাস শব্দ। শালবনে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। রক্তাভ অন্ধকার ধীরে-ধীরে আকাশের পরদায় যবনিকা টেনে দিচ্ছে।

শ্রীনাথ ভট্টাচার্যকে কাজে বহাল করলাম।

সেই বৃদ্ধ বয়সেও লোকটার অদ্ভুত শারীরিক ক্ষমতার পরিচয় সামান্য পেয়েছিলাম। দরকার হলে গাঁইতি চালাতে ভট্টাচার্য জোয়ান সাঁওতালি কুলির চেয়ে কম যেত না। কিন্তু শারীরিক ক্ষমতার চেয়ে তার চোখে কী যেন ছিল! কুলিরা দুদিনেই তার অদ্ভুত বশ হয়ে পড়ল। তার যা কাজ সে সুসম্পন্ন করে দিয়ে যেত, কিন্তু সন্ধ্যার পর আর ভট্টাচার্যকে পাওয়া যেত না। কর্মক্লান্ত দিনের পর মানুষ খোঁজে শুধু দেহের নয়, মনেরও অবসর। কতদিন ডেকেছি, ভট্চাজ্ মশাই, আসুন আজ একটু দাবা খেলা যাক্।

একটু হেসে ভট্টাচার্য জবাব দিয়েছে, ভুলে গেছি সরকার মশাই!

আসুন না শিখিয়ে দেব।

এ বয়সে আর ও শিখতে চাই না।

একটু বিরক্ত স্বরেই বলেছি, ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়ে দিয়ে যাবেন দয়া করে?

একদিন মেট কুলি মথুরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সন্ধ্যের পর ভট্টাচার্য কী করে রে? পূজো-আচ্চা করে বুঝি?

পূজো কোথায় বাবু? হুই বনের ভেতর সেঁদিয়ে যায়।

বনের ভেতর? রাত্তিরে! কেন রে?

কী জানি বাবু!

আমাদের রাস্তা সেবার অপেক্ষাকৃত ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছে। দুধারে শালের সার, আর মাঝে-মাঝে তাদের টেক্কা দিয়ে ছড়িয়ে আছে ইউক্যালিপ্টাসের দল। রাত্রে অদ্ভুত স্তব্ধতা, অদ্ভুত

বন্য কোলাহল! সেবার বড় ভাল্লুকের উপদ্রব হয়েছিল। প্রায়ই ভোরে উঠে কুলিদের হৈ-চৈ লেগে যেত। কার ছাগলটা গেছে, কার মুরগিগুলো রাতারাতি সাবাড়। কুঁড়েঘরগুলোর আশেপাশে ভাল্লুকের পায়ের বড়-বড় ছাপ। সহর থেকে লাইসেন্স করে এক জোড়া রাইফেল আনিয়ে নিলাম। ভট্টাচার্য দেখে বললে, শুধু-শুধু যেন ওগুলো ব্যবহার করবেন না সরকার মশাই! বনের খোলা জানোয়ার মানুষের বিচার-বুদ্ধি নিয়ে পৃথিবীতে আসেনি।

একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করছি, দূরে নীলাভ পাহাড়গুলোর ওপর মেঘের ছায়া পড়ছে, উড়ে যাচ্ছে নিরুদ্দেশে। ঝিমঝিম করছে আকাশ। শ্রীনাথ ভট্টাচার্য তাঁবুর পরদা ঠেলে ঢুকল।

ভাল্লুক মহুয়া ফুলের মধু খাচ্ছে, দেখবেন সরকার মশাই?

লাফিয়ে উঠে রাইফেলটা টেনে নিচ্ছিলাম।

ওটা থাক্ না। ভট্টাচার্য হেসে বলল।

রাইফেলটা নিয়ে দাঁড়ালাম, কোথায়?

একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে ভট্টাচার্য বলল, আপনি দেখতে পাবেন না সরকার মশাই!

যেমন এসেছিল বেরিয়ে গেল শ্রীনাথ ভট্টাচার্য।

সেদিন ভোরে মথুরার জ্বর এল কাঁপিয়ে। বনে তখন বর্ষা নেমেছে। কাঁসাইএর ওপারে কে যেন বৃষ্টির সাদা পর্দা টেনে দিয়ে গেল।

সারাদিন ভট্টাচার্যের দেখা নেই। মথুরার জ্বর বেড়ে চলেছে। চোখ দুটো ঘোর লাল, ভুল বকে চলেছে আর মাথা চালছে। সন্ধ্যাবেলা সে বেহুঁস হয়ে পড়ল। ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়া সন্দেহ নেই। ডাক্তার হতাশ হয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যের পর কাকের মত ভিজে ভট্টাচার্য ফিরল, হাতে একরাশ

কিসের শেকড়। সেই শেকড়গুলো গরম জলে ফুটিয়ে মথুরাকে খাইয়ে দিতে বলে বলল, ভাল হয়ে যাবে, ভয় নেই।

কী বলছেন ভট্চাজ মশাই ? ডাক্তার যে আশা দিলে না ?

ভাল হয়ে যাবে। এমন একটা স্বরে বলল সে যেন কিছুই হয়নি।

তাঁবুতে ফিরে এসে ডেক্-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিলাম। সারাদিনের ক্লান্তি, তারপর মথুরার মুখের আসন্ন করাল ছায়া মনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। হঠাৎ মনে হল, তাঁবুর ভেতরের কোণটায় একটা কালো ছায়া যেন নড়ে উঠল।

ভয়ের শিহরণ মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ এনে দিল। এক লাফে রাইফেলটা টেনে নিলাম।

তাক্ করেছিলাম কিনা জানি না। ভাল্লুকটা যেন তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার ওপর। একটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ কানে এল, যেন করাল ক্রুদ্ধ গর্জন ! তারপরে রাইফেলের বধির-করা শব্দ। কালো ছায়াটা বিদ্যুতের মত বেরিয়ে গেল।

সম্বিৎ ফিরে এল লোকজনের কোলাহলে। তার মধ্যে শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের গলা কানে এল।

ভাল্লুক ঢুকেছিল বুঝি ? কিছু বলত না সরকার মশাই, আপনিই বোধহয় ভয় পেয়েছিলেন।

রাগ চড়ে গেছে তখন মাথায়।

আপনি থামুন। ভাল্লুকের হয়ে ওকালতি করবেন তো লোকালয়ে না থেকে ভাল্লুকের সঙ্গে বসবাস করলেই পারেন !

বর্ষার দুর্যোগে—ভট্টাচার্য বলে চলল,—তৈরি আশ্রয় দেখে ঢুকেছিল। জানোয়ার কিনা ! ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের ডেরা চেনেনি। তারপরে লাইটটা টেনে নিয়ে মাটিতে ঝুঁকে পড়ে বলল, চোট খেয়েছে দেখছি। রক্ত।

শ্রীনাথ ভাট্টাচার্য বেরিয়ে চলে গেল।

সেদিন রাত্রে ক্যাম্পখাটের ওপর চাদরটা মুড়ি দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল মুখের ওপর গরম নিঃশ্বাস ফোঁস-ফোঁস করছে। বুকের ওপর তীব্র একটা ভার। একটা পাশবিক বন্য গন্ধ আমার নিঃশ্বাস প্রায় রোধ করে ফেলেছে। দুই থাবার মধ্যে জাপটে ধরেছে আমায় ভাল্লুকটা।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলাম। স্বপ্ন দেখছিলাম। রাইফেলটা নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলাম। ছেঁড়া মেঘের ভেতর দিয়ে শেষ রাত্রের স্তিমিত পাণ্ডুর চাঁদ দিগন্তে হেলে পড়েছে। দূরে একদল শেয়াল হুক্কা-হুয়া হেঁকে শেষ প্রহর জানিয়ে গেল। পৃথিবী তখন কালো সমুদ্রের ভেতর থেকে আলোর দিকে মুখ ফেরাচ্ছে।

দৃঢ় হাতে রাইফেলটা ধরে বনের ভেতর এগিয়ে চললাম। অদ্ভুত রহস্যময় বন যেন সেদিন আমায় যাদু করেছিল! গাছের পাতা বেয়ে টুপ্‌টাপ্ করে থেকে-থেকে জল-ঝরার শব্দ যেন ছেলেবেলার লুকোচুরি খেলার টু-দেওয়ার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। কুর্চি-ফুলের ভেজা গন্ধ এক-এক জায়গায় মাতিয়ে তুলেছিল।

সেই আলো-আঁধারিতে মনে হল, সামনে কী যেন নড়ে উঠল! তার পরের টুকু উপকথার মত শোনাবে। তবু যা ঘটেছিল, নিছক সেইটুকু বলেই শেষ করব।

তোলা রাইফেল আপনি নেমে গেল। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের কোলের ওপর পা তুলে দিয়েছে আর ভট্টাচার্য এক মনে তার পায়ে লতাপাতা দিয়ে কি বাঁধছে!

ভাল্লুকটার একটা ক্রুদ্ধ আওয়াজ শুনে শ্রীনাথ ভট্টাচার্য মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, তারপর যেন সে আমাকেই আশা করছিল এমনিভাবে বলল, একটা পায়ে গুলি লেগেছে। ভেঙে গেছে পা-টা। ভাল হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, আপনি যান সরকার মশাই।

আহত জানোয়ার তার শত্রুকে কখনো ভোলে না। শুধু-শুধু রাইফেলের গুলি খেয়ে মরবে।

নিঃশব্দে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। বাঁধা শেষ করে ভট্টাচার্য উঠে দাঁড়িয়ে মুখে কি যেন একটা শব্দ করল। তারপরে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল বনের ভেতর। পেছনে তার নেংচাতে-নেংচাতে আর গর্‌র্ গর্‌র্ শব্দ করতে-করতে পোষা কুকুর-ছানার মত ভাল্লুকটাও মিলিয়ে গেল। বন তাদের গ্রাস করে নিল।

সেই থেকে শ্রীনাথ ভট্টাচার্যের আর দেখা পাইনি।

তাঁবুতে যখন ফিরে এলাম, মথুরা এসে সেলাম করে দাঁড়াল। সে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে।

শঙ্করের সম্পত্তি

শরতের তুলোট মেঘ আকাশে পাড়ি দিয়েছে নিরুদ্দেশ। রোদের রঙ সোনালি হয়ে এল, তাপ ক্রমশ মিঠে হয়ে আসছে। সমস্ত বাতাসে কেমন একটা আশা উদ্দীপনা, মনটা আপনা থেকে মধুর হয়ে ওঠে। পূজো এসে গেছে প্রায়।

সকালটা ফাঁকা ছিল। চলে এলাম টিবির ওখানে। টিবির ভাল নাম তিমির বোস। কলেজে থাকতেই সেটা সংক্ষেপে টিবিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কয়েকটা আশ্চর্য ক্ষমতার জন্যে টিবি বন্ধুমহলে বিখ্যাত ছিল। তার মধ্যে প্রথম, দৃষ্টিভঙ্গী, দ্বিতীয়, যুক্তি দিয়ে কার্য ও কারণ ঠিক করতে টিবি ছিল অদ্বিতীয়। তৃতীয় তার ক্ষমতা। কোন মানুষকে বাহ্য দৃষ্টিতে যে এত ভুল করা যায়, টিবিই তার উদাহরণ। মাঝারি গড়ন, ছিপছিপে পাৎলা শরীর, চোখ দুটোর ঔজ্জ্বল্য আর চঞ্চলতা ছাড়া আকৃতিতে তার কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্তু যারা জানত তারা বেশ ভাল করেই জানত যে টিবির ডান হাতের ঘুষিটায় আছে এক মণ ওজনের বেগ।

দক্ষিণমুখো লনটায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে টিবি একটা বই পড়ছিল। কয়েকটা সবুজ বেতের চেয়ার সাজানো সামনে। লনটার একপাশ থেকে ঝরা শিউলির সুবাস তখনও ভেসে আছে বাতাসে।

কী সুকুমার? আমাকে দেখে টিবি বলল, মৃদু হাসিতে তার চোখের পাশগুলো কুঁচকে গেছে—যাওয়া কি একেবারে ঠিক করে এলি, না পরামর্শ করতে এসেছিস? পুরীর সমুদ্র, না জব্বলপুরের মার্বল পাহাড়

বিস্মিত হয়ে বললাম, কোথাও যে যাওয়ার মতলবে এসেছি কী

করে জানলি ? তার ওপর পুরী না জব্বলপুর—আমি তো ওই দু-জায়গার কথাই ভাবছিলাম।

হেসে টিবি বলল, তোর পূজোর সময় বেড়ানোর নেশাটা আমার অজানা নেই। তার ওপর পকেটে 'বি এন আর'এর টাইম-টেব্‌ল্ উঁকি মারছে। 'বি এন আর'এর টাইম টেব্‌ল্ দেখে শিলং যাওয়া সুবিধে নয়। মনে আছে গত পূজোয় বলেছিলি এর পরের বার হয় শিলং, নয় পুরী, না হয় জব্বলপুর।

হেসে উঠলাম,—তুই বলার পর নিজেকে বোকা মনে হয়। আমি তো ভাবছিলাম তুই থট-রীডিং শিখছিস।

সেই সময় গেট খোলার আওয়াজ পেয়ে তাকিয়ে দেখি, চেনা-চেনা মুখ, আধময়লা খদ্দর পরা একজন লোক এগিয়ে আসছে।

কে ? শঙ্কর না ? আয় আয়! টিবি বলে উঠল। চিনেছিস তাহলে ?

লজ্জিত হাসি হেসে শঙ্কর বলল, কতকাল পরে দেখা ! কি সুকুমার, ভাল আছিস ?

বললাম, সত্যি কথা বলতে কি, মুখটা চেনা-চেনা লাগলেও ধরতে পারিনি। কি রকম কুঁজো হয়ে গেছিস। এই বয়সে চুলে পাক ধরেছে। কী করছিস এখন ?

জীবন-সংগ্রাম ! গম্ভীর মুখে বেপরোয়া ভাবে জবাব দিল শঙ্কর। তারপরে টিবির দিকে ফিরে বলল, জানিস বোধহয়, সংসারে আমার আর কেউ ছিল না একমাত্র ঠাকুর্দা ছাড়া।

ঠাট্টা করলাম, আমরা ত জানতাম তুই ভুঁইফোঁড়।

শঙ্কর মৃদু হাসল। সেরকম মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন আসল কৃপণ। মনে রাখিস, কৃপণ—কিন্তু স্বার্থপর নন। নিজের জন্যেও জীবনধারণ ছাড়া একটা পয়সা খরচ করেননি তিনি। ছিলেন সেই ধরণের কৃপণ যাকে এক-রকম রোগী বলা চলে। শুধু জমানোর নেশায় জমানো। বড় বন্ধকি কারবার ছিল তাঁর দেশে। বহু লোককে শোষণ করেছেন তিনি, এমনকি নিজেকেও।

একটু থামল শঙ্কর। শেষ কথাটায় বিস্মিত হয়ে তার মুখে তাকালাম। সে মুখে সত্যিই জীবন-সংগ্রামের ছাপ সুস্পষ্ট। মনে পড়ল কলেজে কী কায়ক্লেশে সে লেখাপড়া চালিয়েছে। দু-বেলায় চারটে মাস্টারি, তার ওপর নিজের পড়াশুনো।

হঠাৎ আবার শঙ্কর বলল, আমার সেই ঠাকুর্দা মারা গেছেন।

তাহলে এবার তোর বরাৎ খুলেছে বল ? বলে উঠলাম।

শঙ্কর হাসল—হাসিটা রহস্যময়। বলল, তার মধ্যেও একটু কথা আছে। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ঠাকুর্দার এক চিঠি পাই। শঙ্কর পকেট থেকে ময়লা একটা চিঠি বার করে বলল, এইখানটা শোন। উনি লিখেছেন—আমার কষ্টোপার্জিত ধনসম্পত্তি তুমি এক কথায় এসে অধিকার করবে এত কাঁচা আমায় ভেবো না। সব তোমায় দিয়ে গেলাম বটে, কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বার করতে হবে। পাও তো ভোগ কোরো।

টিবি এতক্ষণ এক মনে শুনছিল, এইবার বলে উঠল—জব্বর লোক তো রে! শেষ পর্যন্ত চরিত্রের সঙ্গতিটুকু বজায় রেখে গেছেন! তারপর ?

তারপর আর কী ? দেশে গিয়ে দেখলাম সব ভোঁ-ভাঁ। যে লোহার শানকি আর গেলাসটায় খেতেন সেটা ছাড়া এককড়িও সম্পত্তি নেই কোথাও। এখন এসেছি তোর কাছে, একটু সাহায্য করবি ?

টিবি আমার মুখের দিকে তাকালো, তারপর বলল, নিশ্চয়।

* * * *

ট্রেনে বসে টিবি জিগেস করল, এইবার বল দেখি শঙ্কর, কী রকম খোঁজ করেছিস ?

শঙ্কর বলল, দেশের বাড়িটা আমাদের মেটে, তিনখানা ঘর।

বাড়িতে তোর ঠাকুর্দার সঙ্গে আর কে থাকত ?

কেউ নয়।

তোর ঠাকুর্দার রান্না-খাওয়া হত কী করে ?

নিজের হাতে।

অত টাকা-কড়ি নিয়ে তিনি একা থাকতেন ?

গম্ভীর মুখে শঙ্কর জবাব দিল, আমার দেশের লোক বোকা হতে পারে, অসৎ নয়। যে-ঘরে ঠাকুর্দা থাকতেন সেই ঘরে মস্ত একটা কাঠের সিন্দুক আছে। মারা যাবার আগে ঠাকুর্দা সেটায় তালা দিয়ে, তালাটায় শীলমোহর করে চাবিটা পরান মোড়লের হাতে দিয়ে যান আমাকে দেবার জন্যে। পরান আমাদের প্রতিবেশী চাষা। ব্রাহ্মণ বলে ঠাকুর্দাকে দেবতা বলেই মনে করত।

আমি বলে উঠলাম, তাহলে ওই সিন্দুকে যা ছিল সব তোর ওই পরানটাই সরিয়েছে। যার যত ধর্মের ভণ্ডামি দেখবি ভেতরে-ভেতরে সেই তত শয়তান।

ধীর ভাবে শঙ্কর জবাব দিল, গাঁয়ের লোক তুই চিনিস না, সুকুমার। ছোটখাটো দলাদলি বিবাদ নিয়ে ওরা থাকে, কিন্তু সহুরে মুখোস ওরা এখনও জানেনা। ধর্মে সত্যিই ওদের এখনও গোঁড়া অন্ধ বিশ্বাস আছে, ভেতরে-ভেতরে ওরা ভীষণ সরল। দেখিস না, সহুরে মহাজন কত সহজে ওদের রাংতা দিয়ে ভুলিয়ে যায় !

তাছাড়া, টিবি বলল, ও সিন্দুকটায় শঙ্করের ঠাকুর্দা কিছুই রাখেন নি। তাহলে ওঁর চরিত্রের সঙ্গতি থাকে না।

ওটা একটা মস্ত ধাপ্পা, শঙ্কর জবাব দিল। আমি শীলমোহর অক্ষত অবস্থাতেই পাই। কিন্তু খুলে দেখলাম একদম ফাঁকা।

আমি জিগেস করলাম, সত্যিই তোর ঠাকুর্দার কিছু ছিল তো ? মানে, ব্যবসায় লোকসান-টোকসান যায়নি তো ? অমুকের বহু টাকা— এ কথা আমরা অনেকের সম্বন্ধেই শুনি—কিন্তু পরে দেখা যায়, সেই অমুক দেনার দায়ে মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে বসে আছে।

দৃঢ় স্বরে শঙ্কর বলল, সে লোক আমার ঠাকুর্দা নয়। মনে পড়ে একবার ছেলেবেলায় অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে জেগে দেখি ঠাকুর্দা পিদ্দিমের আলোয় বসে মোহর গুণছে। আবছা আলোয় মুখে তার

এক ভয়ঙ্কর লোভী নেশা, পেছনের দেওয়ালে দীর্ঘ ছায়াটা একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত কাঁপছে আর হাতের সেই সোনালি মোহরগুলো যেন টুকরো টুকরো রক্ত। ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলি। যাক্, সে কথা যাক। আমিও যে খোঁজ নিইনি ভাবিস নি, স্থকুমার। শেষ দশটা বছর ঠাকুর্দা ব্যবসা গুটিয়ে আনতে থাকেন। প্রথমেই গঞ্জের হাটে খোঁজ নিয়ে জানি সেই সময় থেকে ঠাকুর্দা বহু টাকার সোনা কিনতে থাকেন! কিন্তু কোথায় গেল সে সব?

তোর ঠাকুর্দার চিঠিটা দেখি রে একবার। টিবি বলল। তারপর চিঠিটা পড়ে বলে উঠল—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বার করতে হবে—এই লাইনটা খুব অর্থপূর্ণ, শঙ্কর। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা সাধারণত কী অর্থে আমরা ব্যবহার করি?

শঙ্করের চোখে-মুখে ঔৎস্থক্য দেখা দিল, তুই বলতে চাস উনি সে-সব পুঁতে রেখে গেছেন? খুঁড়ে দেখতে হবে? পরমুহূর্তেই শঙ্কর নিভে গেল—কিন্তু কোথায় খুঁড়বি? তার কোন হদিশ আছে?

টিবি বলল, চল দেখা যাক।

মাঠ পেরিয়ে, ধান-জমির আল ভেঙে আমরা চলেছি। পড়ন্ত সূর্যের আভায় পৃথিবী উদাস। সোনালি ধানের শিষ ফলের ভারে মাথা নিচু করে দিয়েছে। যতদূর দৃষ্টি চলে সবুজ আর সোনালি ধানে আর নীল আকাশে মিশে মিশে একাকার। পাখির দল শস্যের লোভে-লোভে লুকোচুরি খেলছে ধান-ক্ষেতে। সবুজ বিদ্যুৎ হেনে উড়ে গেল একদল টিয়া। মাথার ওপর লাল আকাশে পাখা চালিয়েছে বাদুড়েরা।

শঙ্কর বলল, জল হয়েছে এবার তাই ফসল ভাল। কিন্তু এই সব ক্ষেতের ভেতর দিয়ে যদি খাল আর নালী কেটে দেওয়া যেত তাহলে আমাদের চাষীদের আর আকাশের মুখ চেয়ে থাকতে হত না।

আমরা চলেছি পচা এঁদোপড়া পানা-ঢাকা সবুজ পুকুরের পাড় দিয়ে। পুকুরে জলের চেয়ে জলজের প্রভাবই বেশী।

এই সব পুকুরগুলো কাটিয়ে যদি পরিষ্কার কাঁচের মত টলটলে

করে দেওয়া যেত ! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শঙ্কর বলল—নে, এসে গেছি। পারান ! ও পরান !

সাড়া এল, যাই দাদাঠাকুর !

আমার বন্ধুরা খাবে, জোগাড় দিও।

বুড়ো পরান এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

* * * *

শঙ্করের পিছু পিছু তন্ন তন্ন করে দেখা হয়ে গেল টিবির। মেটে বাড়ি, খোড়ো দেওয়া ছাউনি, মাটির দেয়াল। লুকোবার কোথাও কিছু নেই। বড় ঘরটায় এসে টিবি বলল, সিন্দুকটা প্রকাণ্ড তো রে শঙ্কর ! কী রেখেছিস ?

হেসে শঙ্কর বলল, আমার আর কী আছে ?

ডালাটা খুলে টিবি ঝুঁকে পড়ল তার ভেতর। দেখলাম টিবির ক্ষিপ্র আঙুলগুলো সিন্দুকটার তলাটা অনুভব করে চলেছে।

তোর ঠাকুর্দা, হঠাৎ টিবি বলে উঠল, একটা বাজে খরচ করেছিলেন। সিন্দুকটার ভেতরে মার্বল কাগজ মারা রয়েছে।

হঠাৎ চড়চড় করে খানিকটা কাগজ ছেঁড়ার আওয়াজ কানে এল। কি যেন একটা ধরে টান দিল টিবি।

দেখে যা শঙ্কর ! টিবির গলায় উত্তেজনা।

আমি আর শঙ্কর তখন ঝুঁকে পড়েছি। ক্যাঁচ-কোঁচ করে সিন্দুকটার তলার ডালাটাও খুলে গেল, তলায় কালো অন্ধকার। লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে একটা মইএর দুটো মাথা উঁকি মারছে।

টিবি শুধু বলল, আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম খালি সিন্দুকটায় তালা মেরে শীলমোহর করে যাওয়ার একটা অর্থ আছে।

কিন্তু নিরাশার পর নিরাশা। লুকোনো ধনের একটা উত্তেজনা আছে। সেই রাত্রেই মশাল জেলে আমরা সেই সুড়ঙ্গর ভেতরে নামি। ভেতরে বেশ ছোটখাটো একটা ঘর, কিন্তু সম্পূর্ণ ফাঁকা। উপরে এসে

আশাভঙ্গের অবসাদে কারও মুখে কথা যোগায় না। শেষে শঙ্কর প্রশ্ন করল, এর মানে কী টিবি ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে টিবি জবাব দিল, নিজেকে অতিরিক্ত চালাক ভেবেছিলাম, শঙ্কর। একটু সামলে নিতে দাও।

পরান এসে বলল, সব যোগাড় হয়ে গেছে দা-ঠাকুর, ভাতটা একটু চড়িয়ে নেবেন ?

অবসন্ন গলায় শঙ্কর জবাব দিল, যাচ্ছি।

পরান চলে যাচ্ছিল, টিবি ডাকল তাকে—এ বাড়িটা কে গেঁথেছিল বলতে পার, পরান ?

কোনটা বাবু ? পরান জিগেস করল।

এইটা, এই বাড়িটা।

বাড়িটা তো পুরোনো বাবু, কিন্তু এ ঘরটা পরে গাঁথা হয়—তাও গিয়ে দশটা শাল কেটে গেল। আমার ছোট ছেলেটা সেই শালে জন্মায় মনে আছে।

ও, এ-ঘরটা বুঝি নতুন ? গেঁথেছিল কে ?

পরান হাসে, কেডা আর গাঁথবে বাবু ?

তার মানে ?

কর্তাঠাকুরের তো বাজে খরচ ছিল না। বলতেন, দেহটা দিয়েছে ভগবান খাটবার জন্যে।

তার মানে ? টিবির গলায় উত্তেজনা—তুমি বলতে চাও শঙ্করের ঠাকুর্দা নিজের হাতে এই ঘরটা তুলেছিলেন ?

হ্যাঁ গো বাবু। নিজের হাতে তিনি বাঁশ কেটেছেন, চেলিয়েছেন, বেড়া বুনেছেন, খড় পরিয়েছেন, মাটি লেপেছেন। আপনারা শহরের বাবু, বুঝবেন না।

পরান চলে গেলে নিজের মাথায় দুটো টোকা মেরে টিবি বলল, বোকা! বোকা! তোমার ঠাকুর্দার তারিফ না-করে পারছি না শঙ্কর। শেষপর্যন্ত সঙ্গতি ঠিক আছে। একটা শাবল আছে ?

শাবল দিয়ে দেওয়ালের মাটি আস্তে আস্তে খুঁড়তেই কিছুদূর গিয়ে একটা ধাতব আওয়াজ পাওয়া গেল। আমার আর শঙ্করের নিশ্বাস তখন জোরে জোরে পড়ছে।

লণ্ঠনটা ধর তো শঙ্কর!

লণ্ঠনের আলোয় শাবলের ধারালো মুখে ঘা-খাওয়া সোনার পাতটা নতুন রক্তের মত ঝক-ঝক করে উঠল।

* * * *

তিন দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঘরের দেওয়ালময় বহু সোনার পাত বার করল শঙ্কর। এক রাতে সে লাখপতি।

টিবি একবার বলেছিল, ওই সুড়ঙ্গ ঘরটার মানে বুঝেছিস শঙ্কর? ওইখানে সোনার পাতাগুলো লুকিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ঘরটা তুলেছিলেন তোর ঠাকুর্দা।

শঙ্কর তখন অন্যমনস্ক। তার চোখ জানলা দিয়ে আকাশের এক-প্রান্তে, দূরে যেখানে আকাশের নীলে ধানের শীষের ওপর একটা দোয়েল বসে দুলছে সেইখানে নিবদ্ধ ছিল।

ট্রেনে আমাদের তুলে দিতে এসে শঙ্কর বলল, তোদের উপকার জীবনে ভুলব না ভাই!

আমি বললাম, এত টাকা নিয়ে কী করবি শঙ্কর?

ও টাকা আমার নয়, দেশের। দেশের লোকের রক্ত জমে জমে সোনা হয়ে ফলেছে। দেশের রক্তেই তাকে আবার মিশিয়ে দেব। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সে বলল, কত কী করবার আছে জানিস সুকুমার?

বললাম, আর তোর? তোর কী রইল?

সে হেসে জবাব দিল, জীবন-সংগ্রাম।

ট্রেণ ছেড়ে দিল। দেখলাম ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে মেঠো রাস্তা দিয়ে শঙ্কর চলেছে। রগের দুপাশের চুলগুলোয় তার পাক ধরেছে, শরীরের পেশীগুলো শিথিল। ইঞ্জিন থেকে এক-ঝলক ধোঁয়া এসে তার মূর্তিটা ঢেকে দিল।

বাবলু

তার সুদীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের জীবনে বাবলু কোনদিন মাকে ছেড়ে থাকেনি। রাত্রে শোয়ার সময় দেওয়ালে যখন কালো-কালো ছায়াগুলো পড়ে, তখন মায়ের উষ্ণ কোলের আশ্রয় ছাড়া অন্য কোথাও যে থাকা যায়, এটা তার অনুমানেও আসে না। তাই প্রথম যখন তাকে মাকে ছেড়ে থাকতে হবে কথাটা পাড়া হল সে ওটা একটা অসম্ভব রকমের ঠাট্টা ভেবে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। শুধু উড়িয়ে দেওয়া নয়, বীরত্বও খানিকটা প্রকাশ করে ফেলেছিল—

ভয় করবে কেন ? বাবার মোটা ডাণ্ডাটা পাশে নিয়ে শোব। চোর এলেই···তারপরেই তার চিন্তাধারা অন্য লাইনে চলে যায়—চোর কত বড় মা ? বাবার চেয়েও বড় ? দাদুর চেয়ে ? চোর কেন আসে মা ?

ক্রমে ক্রমে বাড়ির আলোচনার ধারা, বাবার ব্যস্ততা, ডাক্তারবাবুর গাম্ভীর্য আর মায়ের ক্লিষ্ট মুখের পানে তাকিয়ে সন্দেহের একটা কালো রেখা তার মনের মধ্যে উঁকি মারতে থাকে।

বাবলু তো এখন বড় হয়ে গেছে, বাবা বলেন।

বাবলু জোর করে শ্বাস টানে। কার মতো বাবা ? বাবার মতামতের ওপর বাবলুর অগাধ বিশ্বাস।

কার মতো বল দেখি ?

তোমার মতো ?

না এখনও অত বড় হওনি। একটু ছোট আছ।

কবে হব বাবা ? তারপরে বড় হওয়ার পক্ষে সে যুক্তি দেখায়, জান বাবা, ঝুনু আমার সঙ্গে পারে না !

ও! তাই নাকি? তা হলে ত আর দেরি নেই!

আমি চেয়ার থেকে লাফাতে পারি, দেখবে? হাতে-হাতে প্রমাণ করে দেয় বাবলু।

কবে তোমার মতো হব, বলনা? কাল?

বাবার কাছে জবাব না পেয়ে সোজাসুজি ব্যাপারটার অন্তস্তলে চলে যায় বাবলু—মা-র কাছে তো আজ আমি শোবো না। আজ আমার বিছানায় শোব।

বাবা বিস্মিত দৃষ্টিতে বাবলুর মুখের পানে তাকিয়ে বলেন, তাহলে তুমি বাবার মতন! মা হাসপাতালে যাওয়ার সময় কাঁদবে না তো? কাঁদবে কেন, অ্যাঁ? ওইত রাস্তার ওপারে হাসপাতাল দেখা যাচ্ছে। ওই যে, একতালার ওই ঘরটায় মা থাকবে।

কোনটায়?

ওই যে, জানলার সামনে পামগাছটা উঠেছে, ওইটা। কেমন, মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে তো? ব্যাস, বাবলু বাবার মতো বড় হয়ে গেছে।

বড় হবার গর্বে স্বচ্ছন্দে ঘাড় নেড়ে দেয় বাবলু, তারপরে প্রশ্ন করে, হাসপাতাল কী বাবা?

খেলার ফাঁকে ফাঁকে বাবলু পরের দিন প্রায়ই মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায় আবার এক ছুটে বেরিয়ে যায়। আগের দিন সে মায়ের কোনো আপত্তি শোনেনি। বাবার বিছানায় শুয়ে প্রাণপণে চোখ বুজে দেওয়ালের কাছের ছায়াগুলোকে এড়িয়েছে। তারপরে ঘুমিয়ে পড়লে কখন মায়ের বুকের আশ্রয়ে মায়ের পাশে উঠে শুয়েছে সে জানে না। কিন্তু ঘুমের মধ্যে তার হাত দুটো কার নিশ্চিন্ত গ্রীবা জড়িয়ে ধরার জন্য খুঁজে মরেছে।

কিরে বাবলু, কী হয়েছে? তাকে আবার পিছনে ঘুরতে দেখে তার মা প্রশ্ন করেন।

কিছু না। এক-ছুটে সে আবার খেলতে চলে যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর তার মন আর বাধা মানে না।—না মা, তুমি যাবে না। আমি থাকবো না, কক্ষনো না। বাকিটুকু কান্নায় ঢাকা পড়ে যায়।

কিন্তু সত্যি যেদিন মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ি এল তখন তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও বেরুল না। সে তখন বারান্দার এক কোণে গাল ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাবা ডাকলেন, বাবলু যাবিনা ?

বাবলু প্রায় গম্ভীর মুখে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল, না।

মা চলে গেল, বাবলু ছাতে পায়রা ওড়াতে চলে গেল।

বাবলুর দিকে নজর দেবার সময় কোথায় আর-সবার ? বড় অপারেশন। সকলেরই মুখ থমথমে, গম্ভীর।

পরের সমস্ত দিনটা সে সিঁড়িতে বাবার জুতোর শব্দের অপেক্ষা করেছে। যে সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্যে বাবা এসে ঘরে ঢুকেছেন একছুটে বাবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাবার ও কী মুখ! সেবার কালবোশেখীর ঝড়ের পর তাদের বাড়ির পাশের তালগাছটার যেমন চেহারা হয়েছিল, বাবাকে যেন অনেকটা সেই রকম দেখাচ্ছে।

বাবা ?

পায়রার একটা বাচ্ছা হয়েছে বাবা, দেখবে ?

এখন না, আমি বেরোব।

কোথায় ?

হাসপাতালে।

মা যেখানে গেছে ?

হুঁ।

আর তার বাবা তাকে মায়ের কাছে যাবার কথা বলেনি। কেউই বলেনি তারপরে। অভিমানে তার বুক ফুলে উঠেছে। সে এক-ছুটে ছাদে চলে গেছে।

কোথায় যাচ্ছ দাদু ? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে ক্লিষ্ট, গভীর গলায় তার দাদু প্রশ্ন করেছেন।

—পায়রা দেখতে। বাবলু ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি পার। ছাতময় নিবিড় নীল আকাশ মায়ের স্নিগ্ধ মুখের মতো। এক কোণে পায়রাগুলোর নিশ্চিন্ত শিথিল ডাক। বাবলুর দু-চোখ জলে ভরে যায়। তার মা কোথায় ? হাসপাতালে ? কেন ? তাকে নিয়ে যায়নি—সে মাকে ছেড়ে কী করে থাকবে ?

অন্ধকার রাত গভীর হয়ে এল। তখনও রাস্তার আলো আকাশ-বোমার ভয়ে নেভানো। দশটা বেজে গেছে। সমস্ত শহরে একটা নিদ্রালু স্তব্ধতা। তার বিছানার পাশে বসে দাদু ঢুলছে। গড়গড়ার নলটা হাত থেকে খসে পড়ে গেছে কখন। বাবার দেখা নেই। নিঃশব্দে চুপিচুপি উঠে পড়ল বাবলু। দেওয়ালের ছায়াগুলোকে সে কিছুতেই গ্রাহ্য করবে না। নিঃশব্দে সে নিচে নেমে এল। তারপরে দরজাটা খুলতেই একরাশ অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকের ওপর। এক মুহূর্তের জন্যে বাবলু পেছিয়ে এসেছিল, তারপরে তার সাড়ে তিন বছরের সুদৃঢ় পায়ে সে এগিয়ে চলল। একচোখে ঠুলি আঁটা আর একচোখে সুতীক্ষ্ণ আলো জ্বালিয়ে, রাস্তা আর বাবলুর বুক কাঁপিয়ে একটা মিলিটারি ট্রাক্ চলে গেল। এক-ছুটে বাবলু পার হল রাস্তা। ওই তো হাসপাতাল। কিন্তু কোন জানলাটা ?

—মা ! একটা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে-ভয়ে ডাকল বাবলু।

—মা ! ওমা !

—যা, যা ! এটা ভিক্ষের জায়গা নয়। এটা হাসপাতাল। সাড়া এল ভেতর থেকে।

পেছনে অন্ধকারের বুক চিরে সার সার মিলিটারি কনভয় চলেছে। কোথায় মা ? বাড়িটাও আর চেনা যায় না।

—মা, মা ! বাবলুর গলায় এবার কান্না ভেঙে এসেছে, বেপরোয়া ভয়ে সে তখন পামগাছের সামনের জানলাটা বেয়ে উঠে পড়েছে।

—মা ! ও মাগো !

—বাবলু? কে? বাবলু? হঠাৎ ক্ষীণ একটা স্বর ভেসে এল ঘর থেকে।

—মা ! আমি, হ্যাঁ ! বাবলুর গলায় হঠাৎ কান্না-মেশানো দৃঢ়তা।

—কী করছিস তুই ওখানে ?

—তোমাকে দেখতে এসেছি। জানো মা, আমার একটুও ভয় করেনি।

—ভয় করেনি ?

—না, একটুও না। দাদু ঘুমিয়েছিল, আমি একছুটে পালিয়ে এসেছি। বাবলু খিলখিল করে হেসে উঠল।

—কার সঙ্গে এসেছিস ?

—বুক ফুলিয়ে বাবলু জবাব দিল, একলা !

—বোকা ছেলে ! বাবলুর মা তখন কলিং বেল টিপে নার্সকে ডেকেছেন। কত রাত রে এখন, বাবলু? কটা বেজেছে ?

—কি জানি, সাড়ে দুটো হবে বোধহয়। তুমি কখন বাড়ি যাবে ?

—শোন বাবলু। আমি ভাল হয়ে গেছি। অপারেশন হয়ে গেছে। কাল তুই বাবার সঙ্গে এসে আমার কাছে সারাদিন থাকবি। এবার আর তোকে ছেড়ে কোথাও যাব না। এবার বাড়ি যা, কেমন ?

মায়ের গলায় কেমন একটা স্নিগ্ধ আশ্বাস। বাবলু এখন নির্ভয়ে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে পারে।

শোন শোন ! বাবলুর মা ডেকে বলেন,—একা যাসনি, দারোয়ানকে ডেকে দিচ্ছি তার হাত ধরে যা।

—আমি টুপ করে গিয়ে শুয়ে পড়ব, দাদু জানতেও পারবে না ! অদম্য খুশিতে বাবলু খিলখিল করে হেসে ওঠে।